মাধবীকঙ্কণ।

সম্রাট্ শাহজিহানের সাময়িক ঐতিহাসিক
উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত-প্রণীত।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানুহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৭ সাল।

দেশহিতৈষী পণ্ডিতবর

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রিয়সুহৃৎ সুরেন্দ্র!

নয় বৎসর গত হইল তুমি ও সুহৃদ্‌বর বিহারীলাল ও আমি, এই তিনজনে একদিন প্রাতঃকালে মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া একত্রে একই উদ্দেশ্যে বহুদিনের জন্য বহু-সমুদ্র-পার বিদেশযাত্রা করিয়াছিলাম। আমাদের জীবনের মধ্যে সেই স্মরণীয় দিনটী স্মরণ করিয়া অদ্য এ পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ করিলাম। অদ্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি; তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই। সেই মহৎকার্য্যে সফল হও, এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার সহিত এই সামান্য পুস্তকখানি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। এ কঙ্কণ মাধবী-লতায় বিনির্ম্মিত, আমি দরিদ্র, প্রকৃত কবিত্বের সুবর্ণরৌপ্যাদি কোথা পাইব?

দক্ষিণ শাহবাজপুর,
১০ই নবেম্বর, ১৮৭৭।

তোমার স্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

মাধবীকঙ্কণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালকবালিকা।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বীরনগর গ্রামে গ্রীষ্মঋতুর এক দিন সায়ংকালে গঙ্গা-সৈকতে দুইটী বালক ও একটী বালিকা ক্রীড়া করিতেছিল। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া গ্রাম, প্রান্তর ও প্রশস্ত গঙ্গানদী আচ্ছাদন করিতেছে। জলের উপর কয়েক খানি পোত ভাসিতেছে, দিনের পরিশ্রমের পর নাবিকেরা রন্ধনাদিতে ব্যস্ত রহিয়াছে; পোত হইতে দীপালোক নদীর চঞ্চল বক্ষে বড় সুন্দর নৃত্য করিতেছে। বীরনগরের নদীকূলস্থ আম্র-কানন অন্ধকারে আবৃত হইয়া ক্রমে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিতেছে। কেবল বৃক্ষের মধ্য হইতে স্থানে স্থানে এক একটী দীপশিখা দেখা যাইতেছে, আর সময়ে সময়ে পর্ণকুটীরাবলী হইতে রন্ধনাদি সংসার-কার্য্যসম্বন্ধীয় কৃষকপত্নীদিগের কণ্ঠরব শুনা যাইতেছে। কৃষকগণ লাঙ্গল লইয়া ও গরুর পাল হম্বারব করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে; ঘাট হইতে স্ত্রীলোকেরা একে একে সকলেই কলস লইয়া চলিয়া গিয়াছে; নিস্তব্ধ অন্ধকারে বিশাল শান্ত-প্রবাহিণী ভাগীরথী অসীম অনন্ত প্রেমে সমুদ্রের দিকে বহিয়া যাইতেছে। অপর পার্শ্বে প্রশস্ত বালুকাতট ও অসীম কান্তার অন্ধকারে ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে। গ্রীষ্মপীড়িত ক্লান্ত জগৎ সুস্নিগ্ধ সায়ংকালে নিস্তব্ধ ও শান্ত।

তিনটী বালকবালিকায় ক্রীড়া করিতেছে। বালিকার বয়ঃক্রম আট বৎসর হইবে, ললাট, বদনমণ্ডল ও গণ্ডস্থল বড় উজ্জ্বল, তাহার উপর নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। হেমলতার নয়নের তারাদুটী অতিশয় কৃষ্ণ, অতিশয় উজ্জ্বল, সুন্দরী চঞ্চলা বালিকা পরী-কন্যার মত সেই নৈশ গঙ্গাতীরে খেলা করিতেছে।

কনিষ্ঠ বালকটীর বয়ঃক্রম দশ বৎসর হইবে, দেখিলেই যেন হেমলতার ভ্রাতা বলিয়া বোধ হয়। মুখমণ্ডল সেইরূপ উজ্জ্বল ও সুন্দর, প্রকৃতি

সেইরূপ চঞ্চল। কেবল উজ্জ্বল নয়ন দুটীতে পুরুষোচিত তেজোরাশি লক্ষিত হইত ও উন্নত প্রশস্ত ললাটে শিরা এই বয়সেই কখন কখন ক্রোধে স্ফীত হইত। নরেন্দ্রকে দেখিলে তেজস্বী ক্রোধপরবশ বালক বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীশচন্দ্র দ্বাদশবর্ষীয় বালক, কিন্তু মনুষ্যের গম্ভীর ভাব ও অবিচলিত স্থির বুদ্ধির চিহ্ন বালকের মুখমণ্ডলে বিরাজ করিত। শ্রীশচন্দ্র বুদ্ধিমান্, শান্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি বালক।

দুইটী বালকে বালুকার গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল, কাহার ভাল হয় হেমলতা দেখিবে। নরেন্দ্র গৃহ-নির্ম্মাণে অধিকতর চতুর কিন্তু চঞ্চল; হেম যখন নিকটে দাঁড়ায় নরেনের ঘর ভাল হয়, আবার হেম শ্রীশের ঘর দেখিতে গেলেই নরেন ব্যস্ত হয়, হাত কাঁপিয়া যায়, বালুকাগৃহ পড়িয়া যায়। মহা বিপদ্, দুই তিনবার উৎকৃষ্ট ঘর পড়িয়া গেল!

হেম এবার আর শ্রীশের নিকট যাবে না, সত্য যাবে না, যথার্থ যাবে না, নরেন আর একবার ঘর কর। নরেন মহা আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘর আরম্ভ করিল, হেম সম্মুখে বসিয়া দেখিতে লাগিল। কি দেখিতে লাগিল? ঘর—না নরেনের সুন্দর মুখখানি?

ঘর প্রায় সমাধা হইল। হেম ভাবিল নরেনের ত জয় হইবে, কিন্তু শ্রীশ একাকী আছে, একবার উহার নিকট না যাইলে কি মনে করিবে। কেশগুচ্ছগুলি নাচাইতে নাচাইতে উজ্জ্বল জল-হিল্লোলের ন্যায় একবার শ্রীশের নিকট গেল। শ্রীশ ক্ষিপ্রহস্ত নহে, বালুকাগৃহ নির্ম্মাণে চতুর নহে, কিন্তু ধৈর্য্য ও বুদ্ধিবলে একপ্রকার গৃহ করিয়াছে, বড় ভাল হয় নাই।

নরেন একবার গৃহ করে, একবার হেমের দিকে চাহে। রাগ হইল, হাত কাঁপিয়া গেল, উত্তম গৃহ পড়িয়া যাইল। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বালুকা লইয়া হেম ও শ্রীশের গায়ে ছড়াইয়া দিল। শ্রীশের জিৎ, ঘর হইয়াছে, নরেনের ঘর হইল না।

নরেন্দ্রনাথ সাবধান! এ জগতে গুণ থাকিলে জয় হয় না, ভালবাসা থাকিলে জয় হয় না, বিষয়বুদ্ধির আবশ্যক আছে। আজ বালুকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিলে না, দেখ যেন সংসারগৃহ ঐরূপে ছারখার হয় না; দেখ, যেন জীবনের খেলায় শ্রীশচন্দ্র তোমাকে হারাইয়া বিষয় ও হেমলতাকে জিতিয়া লয় না!

নরেন্দ্রনাথের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া ঘাট হইতে একটী সপ্তদশবর্ষীয়া বিধবা স্ত্রীলোক উঠিয়া আসিল। তিনি শ্রীশের জ্যেষ্ঠভগ্নী, নাম শৈবলিনী।

শৈবলিনী আসিয়া আপন ভ্রাতাকে তিরস্কার করিল। শ্রীশ ধীরে ধীরে বলিল—"না দিদি, আমি কিছুই করি নাই, নরেন ঘর করিতে পারে না সেই জন্য কাঁদিয়াছে—হেমকে জিজ্ঞাসা কর।" "তা না পারুক, আমি নরেনের ঘর করিয়া দিব," এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া শৈবলিনী চলিলা গেলেন। শ্রীশ দিদির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল।

হেম ও নরেনের কলহ শীঘ্র নিবারণ হইল। হেম নরেনের ক্রন্দন দেখিয়া সজলনয়নে বলিল—"ভাই তুমি কাঁদ কেন? আমি একটীবার শ্রীশের ঘর দেখিতে গিয়াছিলাম, তোমারই ঘর ভাল হইয়াছিল, তুমি ভাঙ্গিলে কেন? তোমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম, শ্রীশের কাছে এক-বার গিয়াছিলাম বই ত নয়। তুমি ভাই রাগ করিও না, তুমি ভাই কাঁদ কেন।" নরেন কি আর রাগ করিতে পারে, নরেন কি কখনও হেমের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারে? আহা! বাল্যকালের প্রণয় কি পবিত্র, কি নির্ম্মল। ভ্রাতা কনিষ্ঠকে অর্দ্ধেক না দিয়া কোন দ্রব্য আহার করে না; আমরা বালক নহি, আমরা বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত বিষয় ভোগ করিতে চেষ্টা করি। শিশু-ভগিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া বালক ক্রন্দন করে; আমরা বিদ্বান্ হইয়াছি, ভগিনী কষ্টে কালযাপন করিতেছে, হয়ত অন্নের কষ্ট সহ্য করিতেছে, আমরা অট্টালিকায় সুখে কালযাপন করিতেছি। আমরা বুদ্ধিমান্!

তাহার পর বালকবালিকায় কি কথা? আকাশে কেমন তারা ফুটিয়াছে? ও গুলা কি ফুল, না মাণিক? নরেন যদি একটী কুড়াইয়া পায়, তাহা হইলে কি করে? তাহা হইলে গাঁথাইয়া হেমের গলায় পরায়! ঐ দেখ, চাঁদ উঠিবার আগে কেমন রাঙ্গা হইয়াছে, ও আলো কোথা হইতে আসিতেছে? বোধ হয় নদী পার হইয়া খানিক যাইলে ঐ আলো ধরা যায়। না, তাহা হইলে ওপারের লোকে ধরিত। বোধ হয় নৌকা করিয়া অনেক দূর যাইতে যাইতে চাঁদ যে দেশে উঠে তথায় যাওয়া যায়; সে দেশে কি রকম লোক দেখিতে ইচ্ছা করে। নরেন বড় হইলে একবার যাবে, হেম তুমি সঙ্গে যেও।

বালকবালিকা কথা কহিতে থাকুক; আমরা এই অবসরে তাহাদের পরিচয় দিব। এই সংসারে বয়োবৃদ্ধ বালকবালিকারা গঙ্গার বালুকার ন্যায় ছার বিষয় লইয়া কিরূপ কলহ করে, চন্দ্রালোকের ন্যায় বৃথা আশার অনুগমন করিয়া কোথায় যাইয়া পড়ে তাহারই পরিচয় দিব। পরিচয়ে আবশ্যক কি? পাঠক, চারিদিকে চাহিয়া দেখ, জগতের বৃহৎ নাট্যশালায়

কেমন লোক-সমারোহ, সকলেই কেমন নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ধাবমান হইতেছে! কে বলিবে, কি জন্য?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধিমান্ জমীদার।

নরেন্দ্রনাথের পিতা বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী জমীদার ছিলেন, ও ঐ গ্রামে প্রকাণ্ড অট্টালিকা সংস্থাপন করিয়া আপন নামানুসারে গ্রামের "বীরনগর" নাম দিলেন। তাঁহার যথার্থ সহৃদয়তার জন্য সকলে তাঁহাকে মান্য করিত, তাঁহার প্রবল প্রতাপের জন্য সকলে তাঁহাকে ভয় করিত, পাঠান জায়গীরদারগণ ও স্বয়ং সুবাদার তাঁহাকে মান্য করিত।

বাল্যকালে বীরেন্দ্র নবকুমার মিত্র নামক একটী দরিদ্রপুত্রের সহিত একত্র পাঠশালায় পাঠ করিতেন। নবকুমার অতিশয় সুশীল ও নম্র, ও সর্ব্বদাই তেজস্বী বীরেন্দ্রের বশম্বদ হইয়া থাকিত, সুতরাং তাহার প্রতি বীরেন্দ্রের স্নেহ জন্মাইয়াছিল। যৌবনকালে যখন বীরেন্দ্র জমীদারী স্থাপন করিলেন, নবকুমারকে ডাকাইয়া আপনার অমাত্য ও দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। নবকুমার অতিশয় বুদ্ধিমান ও সুচতুর, সুশৃঙ্খলারূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নবকুমার স্বার্থপর হইলেও অতিশয় মন্দলোক ছিলেন না, কৌশলক্রমে বীরেন্দ্রের দুই পাঁচখানি গ্রাম আপনার নামে করিলেন, কিন্তু ভয়ে হউক, কৃতজ্ঞতাবশতঃ হউক, বীরেন্দ্রের কার্য্যের অধিক হানি করেন নাই।

বীরেন্দ্রের মৃত্যুর সময় নরেন্দ্র অতি শিশু, জমীদারী ও পুত্রের ভার প্রিয় সুহৃদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বীরেন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ভালবাসা যতদূর নাবে ততদূর উঠে না। অপত্যস্নেহের ন্যায় পিতৃস্নেহ বা মাতৃস্নেহ বলবান হয় না, দয়া অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা দুর্ব্বল ও ক্ষণভঙ্গুর। নবকুমারের কৃতজ্ঞতা শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল।

নবকুমার অতিশয় গর্হিত লোক ছিলেন না, কিন্তু নবকুমার দরিদ্র, ঘটনাবলি বশতঃ সমস্ত জমীদারী প্রাপ্তির আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইল। সে লোভ, সে আশা দরিদ্রের পক্ষে দুর্দ্দমনীয়। বীরেন্দ্রের পুত্র অতি শিশু, বীরেন্দ্রের স্ত্রীর পূর্ব্বেই কাল হইয়াছিল, শিশুর বিষয় রক্ষা

করে এরূপ জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ ছিল না, দুই এক জন যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা নবকুমারের সহিত যোগ দিলেন। বীরেন্দ্রের বড় সংসারে অন্য কুটুম্বিনী বা আশ্রিতা যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কিছুই জানিলেন না, অথবা অবলা, জানিয়া কি করিবেন?

তথাপি নবকুমার সমস্ত জমিদারী একাকী লইবেন প্রথমে এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। বীরেন্দ্রের জীবদ্দশায়ই দুই পাঁচ খানি গ্রাম আপন নামে করিয়াছিলেন, এখন আরও দুই পাঁচ খানি গ্রাম আপন নামে করিতে লাগিলেন। ক্রমে লোভ বাড়িতে লাগিল। ভাবিলেন আমার একমাত্র কন্যা হেমের সহিত নরেন্দ্রের বিবাহ দিব, অবশেষে বীরেন্দ্রের জমিদারী তাঁহার পুত্রেরই হইবে, এখন নাবালকের নামে জমিদারী থাকিলে গোলমাল হইতে পারে, সম্প্রতি আপন নামে থাকাতে বোধ হয়, কোন আপত্তি হইতে পারে না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সুবাদারের সভাতে সকল প্রধান প্রধান জমিদার ও জায়গীরদারের এক একজন উকীল থাকিত। তাহারা নিজ নিজ মনিবের পক্ষ হইতে মধ্যে মধ্যে নজর দিয়া সুবাদারের মন তুষ্ট রাখিত, ও মনিবের পক্ষ হইতে আবেদন আদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সদরে এইরূপে একটী একটী উকীল না থাকিলে জমিদারীর বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল, এমন কি জমিদারী হস্তান্তর হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল।

বীরনগর জমীদারীর উকীল এক্ষণে নবকুমারের বেতনভোগী, বঙ্গদেশের কানঙ্গু মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেন যে বীরেন্দ্রের মৃত্যু হইতে সে জমিদারীর খাজনা সুশৃঙ্খলারূপে আসিতেছে না, তবে নবকুমার নামে একজন কার্য্যদক্ষ লোক সেই জমীদারির ভার লইয়া আপন ঘর হইতে নিয়মিত খাজনা দিতেছে। নবকুমার বীরেন্দ্রের বিশেষ আত্মীয় লোক ও বীরেন্দ্রের সমস্ত পরিবারকে প্রতিপালন করিতেছে। এই আবেদনসহ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা কানঙ্গু মহাশয়ের নিকট উপঢৌকন গেল। আবেদনের বিরুদ্ধে কেহ বলিবার ছিল না, তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্রের নাম খারিজ হইয়া নবকুমারের নাম লিখিত হইল। অদ্য নবকুমার মিত্র বীরনগরের জমীদার!

জমীদারের হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। যে নরেন্দ্রের পিতাকে পূর্ব্বে পূজা করিতেন, যে নরেন্দ্রকে এতদিন অতি যত্নে পালন করিয়াছিলেন, অদ্য সেই নরেন্দ্র তাঁহার চক্ষুর শূল হইল।

নবকুমারের সাক্ষাতে না হউক অসাক্ষাতে সকলেই বলিত, "নরেন্দ্রের বাপের জমীদারী," "নবকুমারের জমীদারী" কেহ বলিত না। গ্রামের প্রজারাও নরেন্দ্রকে দেখিয়া জমীদার-পুত্র বলিত, প্রকৃত জমীদার নবকুমার কি এ সমস্ত সহ্য করিতে পারেন? তিনি চিন্তা করিতেন, "আমি কি অপবাদ বহন করিবার জন্যই এই জমীদারি করিলাম? পুনরায় নরেন্দ্রের সহিত বিবাহ হইলে কে না বলিবে পিতার জমীদারী পুত্রে পাইল, আমার নাম কোথায় থাকে? এতটা করিয়া কি পরিণামে এই ঘটিবে? আমি কি জমীদার হইয়াও বালকের দেওয়ান বলিয়া পরিগণিত হইব? কার্য্যেও কি তাহাও করিব, সযত্নে জমীদারী রক্ষা করিয়া পরে নরেন্দ্রকে ফিরাইয়া দিব?" বিচক্ষণ প্রগাঢ়মতি নবকুমার স্থির করিলেন যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করা আবশ্যক, তিনি পোষ্যপুত্র লইবেন অথবা কোন দরিদ্রের সহিত আপন কন্যা হেমলতার বিবাহ দিবেন, তাহা হইলে সকলেই জানিবে হেমলতার বাপের জমীদারী জামাতা পাইয়াছে, বীরেন্দ্র ও নরেন্দ্র প্রজাবর্গের স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূত হইবে।

পণ্ডিতবর নবকুমার বিষয়পাণ্ডিত্যে এইরূপ সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্যসাধনে যত্নবান্ হইলেন। নিকটস্থ একটী গ্রামে গোকুলচন্দ্র দাস নামক এক জন ভদ্রলোক এক পুত্র ও এক বিধবা কন্যা ও অল্প সম্পত্তি রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। পুত্রটীর নাম শ্রীশচন্দ্র দাস, কন্যার নাম শৈবলিনী। নবকুমার শ্রীশচন্দ্রকে বীরনগরে আনাইয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী শ্বশুরালয়ে থাকিত কখন কখন ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বীরনগরে আসিয়া দুই এক দিন বাস করিত। ভ্রাতা ভিন্ন বিধবার আর কেহই এ জগতে ছিল না।

বুদ্ধিমান নবকুমার দয়াশূন্য ছিলেন না, বীরেন্দ্রের জ্ঞাতি কুটুম্বকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন নাই, পরিচারিকারূপে তাহারা সকলেই আহারাদি ও কার্য্য করিত, ও দিবানিশি প্রকাশ্যে নবকুমারের গৃহিণীর সাধুবাদ ও খোসামোদ করিত, গোপনে বিধাতাকে নিন্দা করিত। বঙ্গদেশের অভাগিনীদের আর কি সাধ্য? নবকুমার নরেন্দ্রকে এখনও লালনপালন করিতেন, আপন অমাত্যবর্গের নিকট সর্ব্বদাই ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতেন, "কি করি! বীরেন্দ্র জমিদারী বুঝিতেন না।—সমস্ত বিষয়টী খোয়াইয়া ছিলেন, পরের হাতে গেলে বীরেন্দ্রের পরিবার ও পুত্রের কষ্ট হয় সেই জন্য আমিই ক্রয় করিলাম, নচেৎ জমীদারিতে বিশেষ লাভ নাই। এখনও অনাথ নরেনকে আমিই লালন পালন করিতেছি, বীরেন্দ্রের

অনেকগুলি পরিবার, আমিই খাইতে পরিতে দিতেছি, কি করি, মানুষে কষ্ট পায় এতো আর চক্ষে দেখা যায় না। আর ভাবিয়া দেখ, ভগবান টাকা দিয়াছে কি জন্য! পাঁচ জনকে দিতেই সুখ, রাখিতে সুখ নাই, পরকে দিব, তাহাতে যদি আমার কিছু নাও থাকে সেও ভাল।" অমাত্যরা বলিত—"অবশ্য অবশ্য, আপনি মহাশয় লোক, আপনার দয়ার শরীর, সেই জন্যই এমন আচরণ করিতেছেন, অন্যে কি এমন করে? এইত এত জমীদার আছে, আপনি যতটা বীরেন্দ্রের পরিবারের জন্য করেন এত আর কে কাহার জন্য করে? আহা, আপনি না থাকিলে নরেন্দ্রকেই বা কে খাইতে দিত, অন্য অন্য লোককেই বা কে ভরণপোষণ করিত? তাহারা যে দুই বেলা দুই পেট খাইতে পায় সে কেবল আপনার অনুগ্রহে। আপনার মত পুণ্যবান লোক কি আর আছে?" হর্ষ-গদ্‌-গদ্‌ স্বরে ঈষৎ-হাস্য-বিস্ফারিত-লোচনে নবকুমার উত্তর করিতেন—"না বাপু, আমি পুণ্যও জানি না কিছুই জানি না, তবে লোকের দুঃখ দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না, চিরকালই আমার এই রকম, আজ বীরেন্দ্রের পরিবার বলিয়া কিছু নূতন নহে, ইহাতে দোষ হয় আমি দোষী, পুণ্য হয় তাহাই"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নবকুমার অতিশয় গর্হিত লোক ছিলেন না। চাহিয়া দেখ, সকলেই নবকুমারকে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক বলিয়া সমাদর করিতেছে; শুন, সকলেই তাহাকে দয়াশীল ব্রাহ্মণভক্তলোক বলিয়া সুখ্যাতি করিতেছে। অদ্যাপি নবকুমারের ন্যায় লোক লইয়া আমাদের সমাজ গর্ব্বিত রহিয়াছে, তাঁহাদের সর্ব্বস্থানে সমাদর, সর্ব্বস্থানে প্রশংসা, সর্ব্বস্থানে তাঁহাদের প্রভুত্ব! পাঠক, তোমার আমার কি অধিকার আছে যে তাঁহাকে অতিশয় গর্হিত লোক বলিব? তুমি আমি কে? তোমার জন্য কে খবর লইবে? মানী জ্ঞানী বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন নবকুমার মরিলে সমাজ শিরোমণি হারাইবে, সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। যিনি সর্ব্বস্থানে আদৃত, সকলের মান্য, তোমার আমার কি অধিকার আছে তাঁহার নিন্দা করি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনাথা বিধবা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শৈবলিনী সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ধর্ম্মপরায়ণা শান্তচিত্তা বিধবা সন্ধ্যার পূজা সমাপ্ত করিয়া

বালকবালিকাগুলিকে লইয়া গল্প বলিতে বসিলেন। শৈবলিনী মাসে কি দুই মাসে একবার বীরনগরে আসিতেন। শৈবলিনী বড় গল্প করিতে পারিতেন। শৈবলিনীর সন্তানাদি নাই সকল শিশুকেই আপনার বলিয়া মনে করিতেন; এই সমস্ত কারণে শৈবলিনী বালকবালিকাদিগের বড় প্রিয়পাত্র। শৈব আসিয়াছেন, গল্প করিতে বসিয়াছেন শুনিয়া সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার সমস্ত বালকবালিকা একত্র হইল, কেহই শৈবলিনীর অনাদরের পাত্র ছিল না। কাহাকেও ক্রোড়ে, কাহাকেও পার্শ্বে, কাহাকেও সম্মুখে বসাইয়া শৈব মহাভারতের অমৃতমাখা গল্প করিতে লাগিলেন। আমরা এই অবসরে শৈবলিনীর বিষয় দুই একটী কথা বলিব।

শৈবলিনীর পিতা সামান্য সঙ্গতিপন্ন ও অতিশয় ভদ্রলোক ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ও শৈবলিনী পিতার গুণগ্রাম ও মাতার ধীরস্বভাব ও নম্রতা পাইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে শৈবলিনী বিধবা হইয়াছিলেন, স্বামীর কথা মনে ছিল না, সংসারের সুখ দুঃখ প্রায় জানিতেন না, এ জন্মে চির-কুমারী বা চিরবিধবা হইয়া কেবল মাতার সেবা ও ছোট ভাইটীর যত্ন ভিন্ন আর কোন ধর্ম্ম জানিতেন না।

শৈবলিনীর পিতার মৃত্যুর পর তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল, এমন কি অন্নের কষ্ট কাহাকে বলে অভাগা শৈবলিনী ও তাহার মাতা জানিতে পরিলেন। কিন্তু সেই শান্ত নম্র বিধবা একবারও ধৈর্য্যহীন হন নাই, অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান ও পূজাদি সমাপন করিয়া কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা বৃদ্ধমাতা ও শিশু ভ্রাতাকে ভরণপোষণ করিতেন। প্রত্যূষে প্রফুল্ল পুষ্পের ন্যায় প্রফুল্ল শৈবলিনী নিজ কার্য্য আরম্ভ করিতেন; শান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে শান্তচিত্তা বিধবা কার্য্য সমাপন করিয়া মাতার সেবায় ও শিশু ভ্রাতার লালনপালনে রত হইতেন। সেই কৃষ্ণকেশ-মণ্ডিত শ্যামবর্ণ নম্র বাক্যশূন্য মুখখানি ও আয়ত শান্তরশ্মি নয়ন দুইটী দেখিলে যথার্থই হৃদয় ভ্রাতৃস্নেহে আপ্লুত হয়, যথার্থই বোধ হয় যেন সায়ংকালের শান্তি ও নিস্তব্ধতায় শৈবলে আবৃত মুদিতপ্রায় শৈবলিনী মুখখানি নত করিয়া রহিয়াছে।

এ জগতে শৈবলিনী কিছুরই আকাঙ্ক্ষিণী নহে। বিধবা শৈবলিনী সহচর চাহে না, যে আম্রবৃক্ষ ও বংশবৃক্ষ শৈবলিনীর নম্র কুটীর চারিদিকে সস্নেহে মণ্ডিত করিয়া মধ্যাহ্নে ছায়া বর্ষণ ও সায়ংকালে মৃদুস্বরে গান করিত, তাহারাই শৈবলিনীর সহচর, তাহারাও যেমন প্রকৃতির সন্তান শৈবলিনীও সেইরূপ প্রকৃতির সন্তান; জগদীশ্বর তাহাদেরও ভরণপোষণ

করিতেন, অনাথা শৈবলিনীকেও ভরণপোষণ করিতেন। শৈবলিনী শৈশবে বিধবা কিন্তু প্রেমের আকাঙ্ক্ষিণী নহে, কেননা সমগ্র জগৎ শৈবের প্রেমের জিনিষ। বৃক্ষে বসিয়া যে কপোতকপোতিনী গান করিত, তাহারাও শৈবের প্রেমের পাত্র, তাহাদের সঙ্গে শৈব একত্রে গান গাইত, তাহাদের প্রত্যহ তণ্ডুল দিয়া পালন করিত। যখন বৃদ্ধ মাতাকে সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিত, তখনই শৈবলিনীর হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হইত, মাতাকে সুখী দেখিলে শৈবের নয়ন যথার্থই আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হইত। যখন শিশু শ্রীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিত, সেই চুম্বনে যখন শিশু আহ্লাদিত হইয়া "দিদি" বলিয়া শৈবকে চুম্বন করিত; তখন যথার্থই শৈবের হৃদয় নাচিয়া উঠিত, অশ্রুতে বসন ভিজিয়া যাইত। আর যখন সায়ংকালে শান্ত নিস্তব্ধ নদীর প্রশস্ত বক্ষে চন্দ্রতারাবিভূষিত স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সেই ভগবানের কথা মনে পড়িত, যিনি তারা, চন্দ্র, স্বর্গ, নদী করিয়াছেন, যিনি পক্ষিকে শাবক দিয়াছেন ও শৈবকে শ্রীশ দিয়াছেন, তখনই যথার্থ শৈবলিনীর হৃদয় অনন্ত প্রেমে সিক্ত হইত। শৈবলিনীর স্বামী বা পুত্র নাই, শৈবলিনীর প্রেমের একমাত্র ভাগী কেহ ছিল না, সুতরাং বর্ষাকালের নদী-স্রোতের ন্যায় শৈবের স্নেহবারি চারিদিকে বহিয়া যাইত। গ্রামের সমস্ত বালক-বালিকাকে শৈব বড় ভালবাসিত; শৈব অনাথা দরিদ্রদিগের সমদুঃখিনী। পশুপক্ষীও শৈবের প্রেমের ভাগী, জগতে শৈবলিনীর ন্যায় প্রেমিক আর কে আছে? জগৎ যেরূপ বিস্তারিত, সমুদ্র যেরূপ গভীর, আকাশ যেরূপ অনন্ত, শৈবলিনীর প্রেম সেইরূপ বিস্তারিত, গভীর, অনন্ত।

এইরূপে কিছুকাল বিগত হইলে শৈবলিনীর মাতার কাল হইল। ধীরস্বভাব, রূপবান, ভদ্রবংশজাত শ্রীশচন্দ্রকেও নবকুমার আপন কন্যার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছায় বীরনগরে লইয়া গেলেন; যাহাদের জন্য শৈবলিনী শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা না থাকায় শৈবলিনী পুনরায় শ্বশুরালয়ে গেলেন ও তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পরদিন প্রাতে শৈবলিনী সজলনয়নে শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বালিকা কাহার ?

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনাবলির পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। পাঁচ বৎসরে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, পাঠক মহাশয় তাহা অনুভব করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র এক্ষণে সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের যুবক, ধীর, শান্ত, বিচক্ষণ, ধর্ম্মপরায়ণ। তাঁহার প্রশস্ত উদার সুন্দর মুখমণ্ডল ও উন্নত অবয়ব দেখিলেই তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতি, ও স্থির বুদ্ধি জানিতে পারা যায়।

নরেন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষের উগ্র যুবা, শ্রীশ অপেক্ষাও উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ, উন্নতকায় ও তেজস্বী, কিন্তু অতিশয় উগ্র, ক্রোধপরবশ ও অসহিষ্ণু। নবকুমারের ঘৃণা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, শ্রীশচন্দ্রের যথার্থ গুণের কথাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিত। এখন পর্য্যন্ত যে তিনি এ সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন সে কেবল হেমলতার জন্য। মরুভূমিতে একমাত্র প্রস্রবণের ন্যায় হেমলতার অমৃতমাখা কথা ও অমৃতমাখা মুখখানি নরেন্দ্রের উত্তপ্ত হৃদয় শান্ত ও শীতল করিত। হেমলতার জন্য নবকুমারের তিরস্কারও সহ্য করিতেন, আপন বিজাতীয় ক্রোধও সম্বরণ করিতেন।

হেমলতা ত্রয়োদশ বর্ষের বালিকা। আকাশে প্রথম উষাচিহ্নের ন্যায় প্রথম যৌবনচিহ্ন হেমলতার শরীরে প্রকাশ পাইতেছে। নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি লম্বমান হইয়া বক্ষঃস্থল ও গণ্ডস্থল আবরণ করিতেছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যৌবনারম্ভে অধিকতর উজ্জ্বল আভায় প্রকাশ পাইতেছে। উজ্জ্বল, কৃষ্ণ, আয়ত নয়ন দুইটী বাল্যকালসুলভ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ধীর ও শান্ত ভাব ধারণ করিতেছে, সমস্ত অবয়ব ও ব্যবসায় ক্রমে গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেছে।

সেই সুগঠিত, কুসুম-বিনিন্দিত শরীরে কি নব নব ভাব প্রবেশ করিয়াছে তাহা বর্ণনায় আমরা অক্ষম, তবে হেমলতার আচরণে যাহা লক্ষিত হয় তাহাই বলিতে পারি। হেম এখনও নরেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিতে বড় ভালবাসে, তথাপি নরেন্দ্র নিকটে আসিলে এক একবার হেমের হৃদয় সহসা বিচলিত হয়, লজ্জাবিহ্বলা বালিকা মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কথা কহে, ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের মুখের দিকে নয়ন উঠাইয়া আবার মস্তক

অবনত করে। আহা! সেই আয়ত প্রশান্ত নয়ন দুইটী নরেন্দ্রের মুখের উপর চাহিতেই বড় ভালবাসে, সেই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় নরেন্দ্রের কথা ভাবিতে বড় ভালবাসিত। হেম বালিকা, হেম কিছু জানে না, কিন্তু যখন সায়ংকালে নরেন্দ্র নৌকা আরোহণ করিয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, বালিকা কেন গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া স্থিরনয়নে সেই দেবমূর্ত্তি আলোচনা করে? যখন নৌকা অনেক দূর ভাসিয়া যায়, সন্ধ্যার অপরিস্ফুট আলোকে যতদূর দেখা যায়, বালিকা সজলনয়নে কেন সেই গঙ্গার অনন্ত স্রোত নিরীক্ষণ করে? যখনই নরেন্দ্র "হেম" বলিয়া কথা কহিতে আইসে, তখনই কি জন্য সেই আনন্দদায়ী শব্দে হেমের হৃদয় ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠে? যখন দুই একদিনের জন্যও নরেন্দ্র ভিন্ন গ্রামে গমন করেন, কেন প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে হেম অন্যমনা হইয়া থাকে?

তথাপি হেমের মনের কথা কেহ জানে না। কপোতিনী যেরূপ আপন শাবকটীকে অতি যত্নে কুলায় লুকাইয়া রাখে, বালিকা এই নূতন ভাবনাটীকে অতি সঙ্গোপনে হৃদয়ের হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিত। অগ্নি যেরূপ বস্ত্রাবৃত হইলে সেই সমস্ত বস্ত্রকে অগ্নিময় করে, নরেন্দ্রের চিন্তা হেমের হৃদয়ে লুক্কায়িত হইয়া হৃদয়কে নরেন্দ্রময় করিল! তথাপি বালিকা এই ভাব প্রকাশ হইতে দেয় নাই; যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই সঙ্গোপনের যত্ন অধিক হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ নবকুমার হেমকে এখনও বালিকা মনে করিতেন, সেই বালিকার উদার সরল মুখখানি দেখিলে কেনই বা না মনে করিবে? বিবাহ দিলে একমাত্র কন্যা পরের হইবে, এই ভয়ে যতদিন পারিলেন বিবাহ না দিয়া রাখিলেন। বুদ্ধিমান শ্রীশচন্দ্রও হেমের হৃদয়ের পরিচয় পাইলেন না, কিরূপেই বা পাইবেন? হেম তাঁহার সহিত অকপটে সরল হৃদয়ে সর্ব্বদাই নিঃসঙ্কোচে কথা কহিত। নরেন্দ্রের সহিত সঙ্কুচিতভাবে কখন কখন কথা কহিত। শ্রীশচন্দ্রের নিকট হেম প্রত্যহ কিছু কিছু পড়িতে শিখিত, পাঠ বলিয়া লইত, পড়া হইলে পড়া দিত, যত্নের সহিত শ্রীশচন্দ্রের উপদেশবাক্য গ্রহণ করিত। নরেন্দ্র পড়াইতে আসিলে বালিকা মন স্থির করিতে পারিত না, নরেন্দ্র পড়া লইতে আসিলে বালিকা কিছুই বলিতে পারিত না, সমস্ত ভুলিয়া যাইত। সংসারকার্য্যের তাবৎ ঘটনাই হেম শ্রীশচন্দ্রের নিকট বলিত, শ্রীশের উপদেশ ভিন্ন কোন কার্য্য করিত না। নরেন্দ্র উপদেশদাতা নহেন, নরেন্দ্র আসিলে অন্য কথা হইত,

অথবা অনেক সময়ে কথা হইত না। শ্রীশ কেন না মনে করিবেন যে বালিকার হৃদয়ে যেটুকু প্রণয় বা স্নেহ আছে তাহা শ্রীশকেই অবলম্বন করিয়াছে; বালিকা কাহার প্রণয়িণী? শ্রীশচন্দ্রের না নরেন্দ্রের?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে শ্রীশ ও নরেন্দ্র একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গায় বিচরণ করিতেছিলেন। নরেন্দ্র আপন বলপ্রকাশ অভিলাষে দাঁড়ীকে উঠাইয়া দিয়া দুই হস্তে দুইটী দাঁড় ধারণ করিয়া নৌকা চালাইতেছিলেন, শ্রীশ স্থিরভাবে বসিয়া প্রকৃতির সায়ংকালীন শোভা দর্শন করিতেছিলেন। শ্রীশ ও নরেন্দ্রের মধ্যে কখনই যথার্থ প্রণয় ছিল না, অদ্য অল্প কথা লইয়া তর্ক হইতে লাগিল। নরেন্দ্রের হস্ত হইতে সহসা একটী দাঁড় স্খলিত হওয়াতে নরেন্দ্র পড়িয়া গেলেন, শ্রীশ উচ্চ হাস্য হাসিয়া বলিলেন, "যাহার কায তাহাকে দাও, বীরত্বে আবশ্যক নাই।" সেই সময়ে নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে, তীরস্থ অট্টালিকা হইতে হেমলতা দেখিতেছিল। হেমলতার সম্মুখে অপদস্থ হইয়া নরেন্দ্র মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহার উপর শ্রীশের রহস্য কথা সহ্য হইল না, তিনি অতিশয় কঠোর উক্তিতে প্রত্যুত্তর করিলেন। তর্ক বাড়িতে লাগিল, অল্প বিষয় লইয়া কখন কখন বিষম বিবাদ হয়, অদ্য তাহাই ঘটিল। শ্রীশ প্রকৃতিসুলভ ধৈর্য্যসহকারে ধীরে ধীরে তর্ক করিতেছিলেন, নরেন্দ্র স্বভাবতঃ অধীর; শ্রীশের ধৈর্য্য দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি অতি শীঘ্র অগ্নিবৎ ক্রোধ-প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন ও অতিশয় অন্যায় কটু ভাষায় শ্রীশকে তিরস্কার করিলেন। শ্রীশ এবার কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন, "তোমার মত নীচাশয় অভদ্র লোকের সহিত কলহ করিলেও অপমান আছে;" এইমাত্র বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। নরেন্দ্রের ললাটে শিরা স্ফীত হইল, নয়ন প্রজ্জলিত হইল, নিস্তব্ধ হইয়া শ্রীশের দিকে পরুষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। চিন্তা করিতে করিতে সহসা শ্রীশকে প্রহার করিতে উঠিলেন। নৌকায় জল ছিল, পদস্খলন হইয়া নরেন্দ্র সজোরে নৌকায় পতিত হইলেন ও তথা হইতে প্রায় সংজ্ঞাশূন্যভাবে

গড়াইয়া জলে পতিত হইলেন। নৌকার কাষ্ঠে তাঁহার মস্তক আহত হওয়ায় তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন।

উদারচিত্ত শ্রীশচন্দ্র তখন ক্রোধ বিস্মরণ হইয়া দাঁড়ীদিগের পূর্ব্বেই স্বয়ং জলে পড়িলেন ও অনেক যত্নে মুমূর্ষু নরেন্দ্রকে পুনরায় নৌকায় উঠাইলেন। যত্নে তাঁহার চৈতন্য সাধন করিয়া ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কেন ভাই আমাদের মধ্যে বিরোধ হয়, তোমার সহিত কলহ করি আমার ত এমন ইচ্ছা নহে, তবে তুমি কেন আমার সহিত কলহ করিতে ভালবাস ?" এই স্নেহসূচক বাক্যেও গর্ব্বিত নরেন্দ্রের মনস্তুষ্টি হইল না। যে শ্রীশচন্দ্রকে সকলেই সুখ্যাতি করে, যে শ্রীশচন্দ্রকে তিনি বোধ হয় সেই জন্যই দেখিতে পারেন না, সেই শ্রীশচন্দ্র যে তাঁহার অদ্য জীবন রক্ষা করিয়াছে এই চিন্তায় তাঁহার অতিশয় আত্মঘৃণা হইল। তিনি কোন কথা কহিলেন না।

অতি সামান্য বিষয় হইতে কখন কখন বিষম ঘটনা হইয়া থাকে। শ্রীশের সঙ্গে সামান্য কলহ নরেন্দ্রের বিষম দুঃখের কারণ হইয়া উঠিল। সেই দিন সায়ংকালে নবকুমার নরেন্দ্রকে ডাকাইয়া যথোচিত তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন—

"শ্রীশচন্দ্রের সহিত কলহ করিতে তোমার লজ্জা হয় না, জাননা তুমি কে আর শ্রীশ কে ? তুমি কি শ্রীশের সমান ?"

নরেন্দ্র হেমলতাকে স্মরণ করিয়া অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, অদ্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না ; ক্রোধকম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

"আমি শ্রীশের সমান নহি। আমি জমীদার বীরেন্দ্রের পুত্র, শ্রীশ পথের কাঙ্গালী, পরের অন্নে পালিত। তাহার সমান আমি কিরূপে ?"

নবকুমার এরূপ উত্তর কখন শুনেন নাই, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"কাহার সহিত কথা কহিতেছ জান ?" নরেন্দ্র বলিলেন, "জানি, যে দরিদ্র সন্তান আমার পিতাকর্ত্তৃক পালিত হইয়া কালসর্পের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার বিষয়টী লইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই বিষম প্রবঞ্চকের সহিত কথা কহিতেছি।" নরেন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল।

নবকুমার এক মুহূর্ত্তের জন্য নিরুত্তর হইলেন। কি বিষয় তাঁহার স্মরণ হইতেছিল, কি ভাব উদয় হইতেছিল, বলিতে পারি না ; কিন্তু বুদ্ধিমান্ নবকুমার শীঘ্র সে ভাব সঙ্গোপন করিয়া কর্কশস্বরে বলিলেন—

"কৃতঘ্ন বালক! তোর পিতা নিজ দোষে জমিদারী হারাইয়াছে, অনাথকে এত দিন পালন করিলাম তাহার এই ফল! অদ্যই আমার বাড়ী হইতে দূর হ।"

"চলিলাম! কিন্তু যদি ইহজন্মে কি পরজন্মে বিচার থাকে, নবকুমার! তুমি তাহার ফলভোগ করিবে।" নরেন্দ্র সরোষে গৃহের বাহিরে আসিলেন।

সায়ংকালে গঙ্গাতীরে হেমলতা একাকী বিচরণ করিতেছিল। যে যে ঘটনা হইয়াছিল, হেমলতা সমস্ত শুনিয়াছিল। হেমলতাকে দেখিয়া নরেন্দ্র একবার দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, রক্তবর্ণ চক্ষুতে এক বিন্দু জল আসিল। ধীরে ধীরে হেমলতার হাত দুইখানি ধরিয়া কম্পিত গদ্‌গদ্‌-স্বরে বলিলেন, "হেমলতা, আমি জন্মের মত চলিলাম, বিদায় দাও।" সহসা বজ্রাহত তরুর ন্যায় হেমলতা ভূতলে পড়িয়া গেল।

নবকুমার এই ব্যাপার দেখিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েকজন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া আসিয়া নরেন্দ্রকে দূর করিয়া দিবার আদেশ দিলেন। ক্রোধে নরেন্দ্রের ললাটে শিরা স্ফীত হইতে লাগিল, নবকুমারের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি মুহূর্ত্ত পরেই পিতার গৃহ জন্মের মত ত্যাগ করিব; কিন্তু এই মুহূর্ত্ত আমাকে বিরক্ত করিও না, আমার নিকট আসিও না। আমার জ্ঞান নাই, উন্মত্তের নিকট আসিও না।" নরেন্দ্রের স্বর স্থির ও গম্ভীর, নবকুমার সেই ভীষণ আকৃতি দেখিয়া অগত্যা একটু সরিয়া গেলেন।

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে হেমলতাকে তুলিয়া বলিলেন, "হেমলতা, কাঁদিও না, সমস্ত জীবন কাঁদিবার সময় আছে, একবার আমার কথা শুন—

"আমি আজি জন্মের মত চলিলাম। কোথায় যাইতেছি, কি করিব, তাহা আমি জানি না, কিন্তু সে চিন্তা করি না; জগতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী রহিয়াছে, আমারও থাকিবার স্থান হইবে।

"কিন্তু এই জনাকীর্ণ জগতে আমি অদ্য হইতে একাকী। নানা দেশে নানা স্থানে অনেক লোক দেখিব, সকলেই সমাজমধ্যে, বন্ধুবর্গ মধ্যে, গৃহ মধ্যে বাস করিতেছে, তাহার মধ্যে আমি বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, একাকী। জীবনে নরেন্দ্রকে আপনার ভাবিবে এরূপ লোক নাই, নরেন্দ্রের মৃত্যুকালে শোক করিবে এরূপ লোক নাই।"

হেমলতার চক্ষুজলে বস্ত্র ও শরীর সিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে আর না থাকিতে পারিয়া চীৎকার শব্দে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। নরেন্দ্রের চক্ষু উজ্জ্বল, কিন্তু জলশূন্য ; আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

" হেম, ক্ষণেক স্থির হও, কাঁদিও না, আমি এক্ষণে কাঁদিতে পারি না। আমার মনে যে ভাব হইতেছে তাহা ক্রন্দনে ব্যক্ত হয় না। হেম, তুমি আমাকে ভালবাস, জগতের মধ্যে তুমি এক একবার নরেন্দ্রের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতে, নরেন্দ্রের বিষয় সস্নেহচিত্তে ভাবিতে ; কিন্তু নরেন্দ্র তোমাকে কিরূপ গাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাসিত, অন্ধকার, সুখশূন্য, জীবন-আকাশের মধ্যে একটী প্রণয়-তারার প্রতি কিরূপ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত, তাহা হেমলতা জান না ; রমণীর হৃদয় সে ভাব ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু এ স্বপ্ন অদ্য সাঙ্গ হইল, জীবনের একমাত্র আলোক অদ্য নির্ব্বাণ হইল, অদ্য হইতে অন্ধকারে দেশে দেশে অরণ্যে অরণ্যে যাবজ্জীবন পরিভ্রমণ করিব।"

নরেন্দ্র ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

" আমার এই দশা হইবে তাহা আমি অনেক দিন অবধি জানিতাম, আমাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে জানিতাম। শ্রীশচন্দ্রের সহিত তোমার পিতা তোমার বিবাহ দিবেন তাহা জানিতাম, সে জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিয়াছি।" নিস্তব্ধ হইয়া ক্ষণেক ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন ; একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, যেন সর্ব্বসহ হৃদয়ও অদ্য বিদীর্ণ হইতেছে। ক্ষণেক পর অতি ধীরে অকম্পিত স্বরে বলিলেন—

" হেমলতা, আমার আর একটী কথা আছে। বাল্যকালে আমরা দুইজনে এই মাধবীলতাটী পুতিয়াছিলাম, আমাদের ভালবাসার ন্যায় লতাটী বাড়িয়াছে, আজ আর ইহার থাকিবার আবশ্যক কি ?" নরেন্দ্র ধীরে ধীরে সেই লতাটী উৎপাটন করিলেন, ও তদ্দ্বারা একটী কঙ্কণ প্রস্তুত করিলেন, ও ধীরে ধীরে হেমলতাকে তাহা পরাইয়া দিয়া বলিলেন—

" ফুল যত শীঘ্র শুকায়, লতা তত শীঘ্র শুকায় না ; হেম, বোধ হয় তুমিও আমাকে কিছুদিন স্মরণ রাখিবে। যদি রাখ, যত দিন নরেন্দ্রের জন্য তোমার স্নেহ থাকিবে, তত দিন এই মাধবী-কঙ্কণটী রাখিও, যখন অভাগাকে ভুলিয়া যাইবে, জাহ্নবীজলে শুষ্কলতা ফেলিয়া দিও।"

শোকবিহ্বলা দগ্ধহৃদয়া হেমলতা বিস্মিত হইয়া নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিল, নরেন্দ্র স্থির, নরেন্দ্রের স্বর গম্ভীর ও অকম্পিত, নরেন্দ্রের চক্ষুতে জল নাই ; কিন্তু অগ্নি জ্বলিতেছে। একি ! নরেন্দ্র কি উন্মত্ত হইয়াছে ?

ধীরে ধীরে হেমের হাত ছাড়িয়া নরেন্দ্র চলিয়া যাইলেন, হেম আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

নরেন্দ্র গৃহত্যাগী। নরেন্দ্র কোন্ দিকে যাইবেন? সম্মুখে সায়ং-কালীন গঙ্গা প্রশস্ত বক্ষঃ বিস্তার করিয়া নরেন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্র হেমের ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ফিরিলেন না, কেবল একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "উঃ! আর সহ্য হয় না!" গঙ্গার বিশাল বক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংসারে একাকিনী।

সায়ংকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন গঙ্গাতীরে বসিয়া একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা অসংখ্য ঊর্ম্মিরাশির দিকে কি জন্য চাহিয়া রহিয়াছে? যতদূর অন্ধকারে দেখা যায়, বীচিমালা উঠিতেছে, নাবিতেছে, পড়িতেছে; তাহার পর একটী ঈষৎ ধূসর রেখা, তাহার পর আর অন্ধকারে দেখা যায় না। দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, হেমের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, তথাপি হেম কিছু দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল, ক্রমে আকাশে তারা ফুটিতে লাগিল, তথাপি হেমের অনুসন্ধান শেষ হইল না; আকা-শের তারার মধ্যে হেমলতা নয়নতারাটী দেখিতে পাইল না; গঙ্গার বিপুল বারিতে হেমের হৃদয়টী ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা আর পাইল না।

রজনীতে জমিদারের বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলেন; জগৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। হেমলতার পক্ষে সে রজনী কি ভীষণ! বালিকা ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া গবাক্ষের নিকট আসিল; ধীরে ধীরে গবাক্ষ উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে দেখিল। দেখিল তারা-পরিপূর্ণ অন্ধকার আকাশের নীচে বিশাল গঙ্গা অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। উঃ! সেই নৈশগঙ্গার দিকে দেখিতে দেখিতে কি হৃদয়বিদারক ভাব হেমলতার হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল। বাল্যকালের ক্রীড়া, কিশোর বয়সের প্রথম ভালবাসা, কত কথা, কত বিষয়, একে একে জাগরিত হইয়া বালিকাহৃদয় দলিত করিতে লাগিল। এক একটী কথা মনে হয় আর হৃদয়ে দুঃখ উথলিয়া উঠে, অবিরল অশ্রুধারায় চক্ষু ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। আবার বালিকা শান্ত হইয়া গঙ্গার দিকে দেখে, আবার একটী

কথা স্মরণ হয়, আবার শোকবিহ্বলা হইয়া অজস্র রোদন করে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিকা অবসন্ন হইল, হায় সে ক্রন্দনের শেষ নাই, সে ক্রন্দন অবারিত, অশান্তিপ্রদ। রজনী একপ্রহর, দ্বিপ্রহর হইল, তথাপি বালিকা গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মানা, অথবা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া নীরবে রোদন করিতেছে।

শোকের প্রথম বেগের উপশম হইল; কিন্তু শোকচিন্তাপরম্পরা নিবারণ হইবার নহে। গণ্ডস্থলে হাত দিয়া একাকিনী গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া হেমলতা ভাবিতে লাগিল। এক একবার হেমলতার নয়নে এক বিন্দু জল আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেটী গড়াইয়া পড়িল, আবার একটী বিন্দু জড় হইতে লাগিল। সে বিন্দুপরম্পরা শুকায় না, সে চিন্তা-পরম্পরা শেষ হয় না।

রজনী শেষ হইল, পূর্ব্বাকাশে রক্তিমাচ্ছটা দেখা যাইতে লাগিল, মলিনা বালিকা তখনও গণ্ডে হস্ত দিয়া গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া আছে। তখনও চিন্তাসূত্র শেষ হয় নাই, জীবনে কি শেষ হইবে?

দিবা হইল, প্রথম সূর্য্যালোকে হেমলতা চকিত হইয়া উঠিল। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, বদনমণ্ডল মলিন, শরীর অবসন্ন। ধীরে ধীরে বালিকা গবাক্ষপার্শ্ব হইতে উঠিল, শূন্যহৃদয়ে শূন্যগৃহে গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সেই কি এক দিন? দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, বালিকা সেই গবাক্ষপার্শ্বে বসিত। যে গঙ্গায় নরেন্দ্র ভাসিয়া গিয়াছে সেই গঙ্গার দিকে দেখিত। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে, গভীর রজনীতে শূন্যহৃদয়া বালিকা সেই গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিত। কত ভাবিত, কত কথা মনে আসিত কে বলিবে? এক দিন নরেন্দ্রনাথ হেমের কাণে কাণে কি বলিয়াছিল, এক দিন ওপার হইতে হেমের জন্য কি আনিয়াছিল, এক দিন গাছ হইতে আম্র পাড়িয়া হেম ও নরেন লুকাইয়া খাইয়াছিল, এক দিন পিতাকে না বলিয়া হেম সন্ধ্যার সময় নরেনের সহিত নৌকায় চড়িয়াছিল, এক দিন হেম নরেনকে ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছিল, এক দিন নরেন হেমের কেশে ফুল দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল; সহস্র সহস্র কথা একে একে নদীজলের হিল্লোলের ন্যায় হেমের হৃদয়ে উঠিত। দ্বিপ্রহর হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত, কখন কখন সন্ধ্যা হইতে গভীর রজনী পর্য্যন্ত হেমলতা ভাবিত, এক একবার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইত, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে বালিকা জল মুছিয়া ফেলিত। নবকুমারের বিপুল সংসারের সে দুঃখের ভাগিনী কে হইবে? হেম কাহাকেও মনের কথা মুখ ফুটিয়া

বলিত না। বালিকা সকলের নিকটেই সঙ্গোপন করিত, বাড়ীর লোকদিগের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া ভাবিত; কখন কখন শোক-পারাবার উথলিলে গোপন করিতে পারিত না; নয়ন হইতে অবিরল বারিধারা বহিত।

ক্রমে বসন্তকালের পর গ্রীষ্মকাল আসিল; প্রকৃতি বঙ্গদেশকে সুস্বাদু ফল, সুদৃশ্য ফুল, সুকণ্ঠপক্ষী দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। নবপল্লবিত বৃক্ষগণ সুমন্দ বায়ুতে মধুর গান করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সুন্দর পক্ষিগণ আনন্দে গান করিয়া নিজ নিজ কুলায় নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। মধ্যাহ্নে ছায়াপ্রদায়ী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিয়া পক্ষিশাবক ও পক্ষিদম্পতীর দিকে চাহিয়া বালিকা হস্তে গণ্ড দিয়া চিন্তা করিত; যতক্ষণ না সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া সেই বৃক্ষাবলী আবৃত করিত, হেমলতার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইত না। তাহার পর বর্ষা আসিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করিল, কৃষকগণ আনন্দে ধান্য কাটিতে লাগিল, গ্রামে, গৃহে, গোলায় ধান পরিপূর্ণ হইল। জগৎ আনন্দিত হইল, কিন্তু হেমের নিরানন্দ হৃদয় শান্ত হইল না। সুন্দর আশ্বিন মাসে জল সরিয়া গেল, গ্রীষ্ম কমিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল, কিন্তু হেমলতার হৃদয়াকাশ তমসাচ্ছন্ন, হেমলতা একাকিনী ম্লান বদনে সেই অম্লান শরচ্চন্দ্র নিরীক্ষণ করিত। একাকিনী নিরীক্ষণ করিত, একাকিনী ভ্রমণ করিত, একাকিনী চিন্তা করিত। আবার শীতকাল আসিল, আনন্দে কৃষকগণ আবার ধান কাটিল, আনন্দে সংসারী, গৃহস্থ, ধনী, কাঙ্গালী সকলেই পৌষপার্ব্বণ করিল, হেমলতার পার্ব্বণের দিন কি ইহ জন্মে আর আসিবে? আবার বসন্তকালে বৃক্ষলতা নবপল্লবে সুন্দর কান্তি ধারণ করিল; সহকার বৃক্ষ মুকুলিত ও মুঞ্জরিত হইল, হেমলতার শুষ্কহৃদয় কি ইহ জন্মে মুঞ্জরিত হইবে?

নবকুমারের বিপুল সংসার। কাহারও কিছু ক্ষোভ নাই, অভাব নাই, দুঃখ নাই। সেই সংসারে স্নেহপালিতা একমাত্র দুহিতা বিষণ্ণা কেন? বিপুল সংসারেও হেমলতা একাকিনী!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জগতে একাকী।

নরেন্দ্র অতিশয় সন্তরণপটু, বাল্যকাল অবধি তিনি সন্তরণ অতিশয় ভাল বাসিতেন। অনায়াসে সন্ধ্যার সময় গঙ্গা পার হইয়া অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত কেবল বালুকা, তাহার পর কেবল অনন্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছে। নরেন্দ্র সেই অন্ধকার নিশীথে সেই সিক্তশরীর ও সিক্তবস্ত্রে সেই বালুকাক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র গঙ্গার অপরপার্শ্বের দিকে দৃষ্টি করিলেন। অন্ধকারেও শ্বেত বীরনগরের প্রাসাদ ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে, নরেন্দ্র সেই দিকে দেখিলেন, আবার চক্ষু ফিরাইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন, আবার স্থির হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কি ভাব হইতেছিল জানি না। নিস্তব্ধ অন্ধকারে গঙ্গার কল কল শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, আর এক একবার দূরে শৃগালের কোলাহল শ্রুত হইতেছে। নরেন্দ্র গঙ্গা দেখিতেছিলেন না, নরেন্দ্র পেচক বা শৃগালের ধ্বনি শুনিতেছিলেন না, তিনি নিঃশব্দে অন্ধকারে বিচরণ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর আবার বীরনগরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘোর অন্ধকারে আর সে গৃহ দেখা যায় না; নরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ফিরিলেন। সম্মুখে যে পথ পাইলেন সেই দিকে চলিলেন।

কোথায় যাইতেছেন, নরেন্দ্র জানেন না; উপরে অসীম গগন, নীচে অসীম প্রান্তর, নরেন্দ্রের চিন্তাও অসীম ও অনন্ত, নরেন্দ্র যে দিকে পাইলেন চলিলেন। পথপার্শ্বে বটবৃক্ষ হইতে নিশাচর পক্ষী নরেন্দ্রকে দেখিয়া কুলায় ছাড়িয়া পলায়ন করিল, নিশাবিহারী শৃগালপাল নরেন্দ্রকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; নরেন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। নরেন্দ্র চলিলেন।

অনেক দূর যাইয়া একটী গ্রামে আসিলেন। গ্রাম নিস্তব্ধ, সকলেই সুপ্ত। কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে, ও বৃক্ষপত্র মধ্যে কোন কোন স্থানে খদ্যোৎমালা ঝিকৃমিক্ করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিয়া গ্রাম্য কুক্কুর শব্দ করিতে লাগিল, দুই এক জন গৃহস্থ

ঘরের দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, নরেন্দ্র কোন দিকে চাহিলেন না, পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গ্রামের পথ ঠিক জানেন না. স্থানে স্থানে বৃক্ষের নীচে ও ঝোপের ভিতর দিয়া যাইতে নরেন্দ্রের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইল। নরেন্দ্র গ্রাহ্য করিলেন না; কতক্ষণে গ্রাম পার হইয়া আবার এক প্রান্তরে পড়িলেন।

আবার প্রান্তর পার হইলেন, অন্য গ্রামে পড়িলেন, আবার নিঃশব্দে গ্রাম পার হইয়া গেলেন। সেই ভীষণ রজনী-যোগে কত গ্রাম অতিক্রম করিলেন, কতদূর যাইলেন জানি না, নরেন্দ্রও বলিতে পারেন না।

সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্র প্রান্তরে দূরে একটী আলোক দেখিতে পাইলেন. সেই আলোক অনুধাবন করিয়া চলিলেন। প্রায় এক ক্রোশ যাইয়া আলোকের নিকট পৌছিলেন; দেখিলেন, কতকগুলি হতভাগা একটী শবদাহ করিতে আসিয়াছে। নরেন্দ্র তখন একবার দাঁড়াইলেন, শব দেখিয়া একবার দাঁড়াইলেন। কাষ্ঠের অগ্নি একবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল, আবার একবার নিস্তেজ হইয়া যাইতেছিল, ঐরূপ আলোকে নরেন্দ্রের আকৃতি ও বিকট মুখমণ্ডল এক একবার দেখা যাইতে লাগিল। যাহারা শবদাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইল। শ্রান্ত পথিক বলিয়া নিকটে আসিতে বলিল। নরেন্দ্র নিকটে গেলেন না, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল নরেন্দ্র পরিচয় দিলেন না; শবদাহীগণ ক্ষণেক নরেন্দ্রের অচল দীর্ঘ অবয়ব ও বিকৃত মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি করিয়া শব ছাড়িয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

শ্মশান ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্র চলিলেন। ক্ষণেক যাইয়া একটী ক্ষুদ্র নদী দেখিতে পাইলেন, আবার ঝাঁপ দিয়া নদীতে পড়িলেন আবার সন্তরণ করিয়া সেই নদী পার হইয়া গেলেন, সিক্তবস্ত্রে আবার গমন করিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পর প্রত্যূষের শীতল বায়ু নরেন্দ্রের শরীরে লাগিল পূৰ্ব্বদিক্ রক্তিমা আভা ধারণ করিল, তথাপি নরেন্দ্রের ভ্রমণ শেষ হইল না।

প্রত্যূষে একটী গ্রামের স্ত্রীলোকগণ কলস লইয়া ঘাটে যাইতেছিল, এক দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ বিকৃত মুৰ্ত্তি মনুষ্যাকৃতি পথে শয়ান দেখিয়া সভয়ে পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল।

প্রাতঃকাল হইল। গ্রামের লোকে সমবেত হইয়া অপরিচিত ঘোরনিদ্রাভিভূত পুরুষকে জাগাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে ধীরে

ধীরে উত্তর দিল " আমার নাম নাই, আমার নিবাস নাই, আমি জগতে একাকী।" নরেন্দ্র ঘোর উন্মত্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজমহল।

নরেন্দ্র সেই দিনই সঙ্কটজনক পীড়াক্রান্ত হইলেন, গ্রামের একজন ভদ্রলোক তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক দিন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। অনেক দিন পর নরেন্দ্র ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন; যখন চলিবার শক্তি হইল, তখন সেই ভদ্রলোককে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া, নরেন্দ্র সে গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

প্রথম শোক ও নৈরাশের বেগ তখন ক্ষান্ত হইয়াছে; নরেন্দ্র তখন হেমলতাকে ফিরিয়া পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন যে সুবাদারের নিকট আপন বিষয় পাইবার আবেদন করিব; পৈতৃক জমিদারি আমার হইলে, স্বার্থপর নবকুমার অবশ্যই আমাকেই কন্যাদান করিবেন।

এই উদ্দেশে নরেন্দ্র সুবাদার সুজার রাজধানীতে পৌঁছিলেন। সম্রাট শাজিহানের পুত্র শাসুজা বঙ্গদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ঢাকা হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, ও বিংশতি বৎসর সুশাসন দ্বারা বঙ্গদেশে সম্যক্ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দেশে প্রায় যুদ্ধ বা কোন রূপ উপদ্রব হয় নাই, ও প্রজাবর্গ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিয়াছিল। ইতিহাসে তাঁহার অনেক সুখ্যাতি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যুদ্ধে যেরূপ বিক্রমশালী ও সাহসী ছিলেন, অন্য সময়ে সেইরূপ ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরতা দেখিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে, কি জমিদার, কি জায়গীরদার, সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত; ও কথিত আছে তাঁহার নিধন সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার জন্য খেদ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উদারস্বভাব দুই একটী দোষে কলঙ্কিত ছিল; যুদ্ধের সময় তিনি যেরূপ সাহসী অন্য সময় তিনি সেইরূপ বিলাসী। আপনি নিরতিশয় সুগঠন পুরুষ ছিলেন, ও সর্ব্বদাই সুগঠন রমণীমণ্ডলীতে পরিবৃত থাকিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার প্রধান রাজ্ঞী প্যারী বানু বঙ্গদেশ

রূপে গুণে ও চতুরতায় অদ্বিতীয়া বলিয়া খ্যাতা ছিলেন, ও বাকপটুতা ও সুমধুর কৌতুকে সর্ব্বদাই সুবাদারের হৃদয় প্রেমরসে সিক্ত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু প্যারী বানুও একাকী সুজার প্রণয়-ভাগিনী ছিলেন না, শত শত বেগম উদ্যানে পুষ্পের ন্যায় সুজার রাজমন্দির আলো করিয়া থাকিত। তাহাদের রূপে বিমোহিত হইয়া সুজা রাজকার্য্য বিস্মৃত হইতেন, কখন কখন ২।৩ দিন ক্রমান্বয়ে মদ্যপান ও আমোদে অতিবাহিত হইত।

এইরূপ সুবাদারের নিকট নরেন্দ্রনাথ আবেদন করিতে যাইলেন, এরূপ সুবাদারের নিকট উচিত বিচার সম্ভব নহে। গঙ্গাতীরে সুন্দর রাজমহল নগরী, এখন ও দেখিতে মনোহর, কিন্তু যখন বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন রাজমহলের অনির্ব্বচনীয় শোভা ছিল। সুবাদারের উচ্চ প্রাসাদ ও রাজবাটী, ওমরাহ ও জায়গীরদারদিগের হর্ম্ম্যাবলি ও বঙ্গদেশের সমস্ত ধনাঢ্য লোকের সমাগমে রাজমহল যথার্থই রাজপুরী বলিয়া বোধ হইত। স্বয়ং গঙ্গা সহস্র ধনাঢ্য বণিকের সহস্র পোত বক্ষে ধারণ করিয়া নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিত। প্রশস্ত রাজপথে যুদ্ধ-বিলাসী, গর্ব্বিত ওমরাহ ও মুসলমান জমিদারগণ সর্ব্বদাই অশ্বে বা হস্তীতে বা শিবিকায় গমনাগমন করিত; হিন্দু বণিক ব্যবসায়ী লোক শান্তভাবে নগরের এক পার্শ্বে বাস করিত ও নিজ ব্যবসায়ে রত থাকিত।

এ সমস্ত দেখিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ রাজমহল যান নাই, এ সমস্ত দেখিয়া তিনি শান্ত হইলেন না। কিরূপে সুবাদারের নিকট নিজ আবেদন জানাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ধনাঢ্য হিন্দু বণিক নরেন্দ্রের পিতাকে চিনিত, কিন্তু নরেন্দ্র এক্ষণে দরিদ্র, দরিদ্রের জন্য কে চেষ্টা করে? নরেন্দ্র যাহার নিকট যাইলেন সেই বলিল, "হাঁ বাপু, তোমার পিতা মহাশয় লোক ছিলেন, তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম, কয়েক দিন এই স্থানে অবস্থিতি কর, পরে দেখা যাবে," ইত্যাদি। নরেন্দ্র বিফলপ্রযত্ন হইয়া রহিলেন।

অনেক দিন পর ঘটনাক্রমে এর্ফান খাঁ নামক এক মোগল জায়গীর-দারের সহিত নরেন্দ্রের পরিচয় হইল। এর্ফান খাঁ বীরেন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন ও যথার্থ মহাশয় লোক ছিলেন; তিনি সাদরে নরেন্দ্রকে আহ্বান করিয়া সত্বর তাঁহার জন্য সুবাদারের নিকট যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তথাপি দরিদ্রের আবেদন বিচারাসন পর্য্যন্ত যায় না, অনেক যত্নে, অনেক দিন পর, এর্ফান অনেক অর্থে সুবাদার ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গের

মন সিক্ত করিয়া এক দিন নরেন্দ্রের আবেদন সুজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

সুন্দর রৌপ্য ও স্বর্ণখচিত সিংহাসনে সুবাদার বসিয়াছেন, রাজবেশে সে সুন্দর অবয়বে বড় সুন্দর শোভা পাইয়াছে। চারিদিকে অমাত্য ও বড় বড় আফগান ও মোগল যোদ্ধাগণ শির নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ও সেই বিস্তীর্ণ বিচারপ্রাসাদ পরিপূর্ণ করিয়াছে। মর্ম্মর-প্রস্তরবিনির্ম্মিত সারি সারি স্তম্ভের উপর চারু খচিত ছাদ শোভা পাইতেছে ও সিংহাসনের দুই দিকে পরিচারক চামর দুলাইতেছে। প্রাসাদের বাহিরে যতদূর দেখা যায়, লোকে সমাকীর্ণ; সুবাদার সর্ব্বদা দেখা দেন না, অতএব অদ্য সকলেই দেখিতে আসিয়াছে।

সুবাদারের সম্মুখে বৃদ্ধ এর্ফান খাঁ উঠিয়া আবেদন করিলেন—

"জেহাঁপনা! এ দাস প্রায় বিংশতি বৎসর হজুরের কর্ম্ম করিয়াছে, সুবাদারের কার্য্যে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, ললাট খড়্গে ক্ষত হইয়াছে। গোলামের কিঞ্চিৎ আবেদন আছে।"

সুবাদার বলিলেন, "এর্ফান, তুমি আমাদের প্রধান অনুচর ও অতিশয় প্রিয়পাত্র, তোমার এমন কি যাচ্ঞা আছে যাহা আমাদের অদেয়?"

এর্ফান ভূমি পর্য্যন্ত শির নোমাইয়া পুনরায় বলিলেন, "জেহাঁপনা! বঙ্গদেশবাসীগণ অতি ভীরু ও দুর্ব্বল; তাহাদের মধ্যে সময় সময় যে আমাদিগের যুদ্ধে সাহায্য করে, সে সুবাদারের প্রীতিভাজন সন্দেহ নাই। জমিদার বীরেন্দ্রসিংহ একজন সেইরূপ লোক ছিলেন।"

সুবাদার বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই হিন্দুর নাম শুনিয়াছি, পাঠানদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধে সে সাহায্য করিয়াছিল।"

এর্ফান পুনরায় তসলীম করিয়া বলিল,—"জেহাঁপনা! যাহা কহিলেন যথার্থ। এই দাস যখন উড়িষ্যার যুদ্ধে গিয়াছিল, স্বচক্ষে বীরেন্দ্রের যুদ্ধকৌশল ও রাজভক্তি দেখিয়াছিল। এই রাজসভায় অনেক পরাক্রান্ত পাঠান ও মোগল যোদ্ধা আছেন, কিন্তু বীরেন্দ্র অপেক্ষা অধিক সাহসী পুরুষ এ গোলাম এ পর্য্যন্ত দেখে নাই।"

সভাস্থদিগের কোষে অসি ঝন্‌ঝনার শব্দ হইল, মুসলমানদিগের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু শাসুজা সহাস্য বদনে বলিলেন—

"এর্ফান, তুমি কাফেরের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছ, কিন্তু অযথার্থ নহে, সে হিন্দু যথার্থ সাহসী ছিল শুনিয়াছি। এক্ষণে তাহার জন্য কি বলিবার

আছে বল, তোমার উপরোধে আমি তাহাকে যে কোন পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি।"

এর্ফান গম্ভীরস্বরে বলিলেন, যিনি সুবাদারের উপর সুবাদার, পাদশাহের উপর পাদশাহ, তিনিই কেবল এক্ষণে বীরেন্দ্রকে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে পারেন। আমি তাঁহার অনাথা বালকের জন্য আবেদন করিতেছি। বালক এক্ষণে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কানঙ্গু মহাশয়ের যোগে এক শঠ তাঁহার পৈতৃক জমিদারী কাড়িয়া লইয়াছে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুবাদার কানঙ্গুকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সময়ে সমস্ত খাজনা ও জমিদারী বিষয় কানঙ্গু মহাশয়ের হস্তে থাকিত, এমন কি বঙ্গদেশের সুবাদার যে সমস্ত কাগজাৎ দিল্লীতে পাঠাইতেন, তাহাও কানঙ্গুর সহি না হইলে গ্রাহ্য হইত না। কানঙ্গু মহাশয় নবকুমারের অর্থভোগী; বিনীতভাবে বলিলেন, "সুবাদার মহাশয়ের আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য; বীরেন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর খাজনা আদায় না হওয়ায় জেহাঁপনা সেই জমিদারী নবকুমারকে দিতে আদেশ দিয়াছিলেন।"

শাস্তুজাকে কোন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন ছিল না, কানঙ্গু মহাশয় যাহা বুঝাইলেন, সুবাদার তাহাই বুঝিলেন; এর্ফানের আবেদন ফাঁসিয়া গেল। এর্ফান রোষে নতশির হইয়া রহিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তে নরেন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া কানঙ্গু মহাশয়ের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছিলেন।

সুবাদার শেষে বলিলেন, "এর্ফান খাঁ! সূর্য্য যে রশ্মি জগতে দান করেন তাহা ফিরিয়া লন না, জমিদারী স্বয়ং দান করিয়া ফিরাইয়া লওয়া রাজধর্ম্ম নহে। কিন্তু বীরেন্দ্রের বালক তেজস্বী দেখিতেছি, বীরেন্দ্রের মত যুদ্ধব্যবসায় শিক্ষা করুক, অবশ্যই উৎকৃষ্ট পুরস্কার ও অন্য জমিদারী এনাম পাইবে।"

সভাস্থ সকলে "কেরামৎ," "কেরামৎ," বলিয়া সুবাদারের কথার প্রশংসা করিল; এর্ফানও অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া সেই দিন হইতেই নরেন্দ্রকে নিকটে রাখিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখাইতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কাশীর যুদ্ধ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার তিন বৎসর পর ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে এক দিন ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রানগরে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আগ্রার রাজদ্বার লোকে সমাকীর্ণ; সমস্ত নগরবাসী ভীত ও শশব্যস্ত; বাজার, দোকান সমস্ত বন্ধ, ওমরাহ, মনসবদার, রাজপুত, মোগল, পাঠান, সকলেই অস্থিরচিত্ত ও চিন্তাবিহ্বল। কার্য্যকর্ম্ম বন্ধ হইল, সকলেই ভীত ও উৎসুক। সম্রাট্ শাজিহান কয়েক দিন অবধি পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন; আজি মিথ্যা সংবাদ রটনা হইল যে, তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

মিথ্যা সংবাদে শীঘ্রই সমুদায় ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইল। বঙ্গদেশ হইতে সুজা, দক্ষিণ হইতে আরংজীব, গুজরাট হইতে মোরদ রণ-সজ্জায় বহিষ্কৃত হইলেন। পিতৃবিয়োগে সকলেই সিংহাসনারোহণে লোলুপ হইলেন। পরে যখন প্রকৃত সংবাদ জানা গেল যে, শাজিহান জীবিত আছেন, তখনও রাজপুত্রগণ রণোদ্যম হইতে নিরস্ত হইলেন না। তাহার প্রধান এক কারণ এই যে, ইতিপূর্ব্বে কয়েক মাস হইতে সম্রাট পীড়াবশতঃ রাজকার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা পিতার শুশ্রূষা করা দূরে থাক, এই অবসরে পিতাকে বন্দীস্বরূপ রাখিয়া সমস্ত রাজকার্য্য আপনিই করিতে লাগিলেন; কোন বিষয়ে পিতার মত লইতেন না; জন্মের মত পিতাকে রুদ্ধ রাখিয়া আপনি রাজকার্য্য করিবেন এইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শঙ্কা করিয়াছিল যে, বিষ প্রয়োগ-দ্বারা যুবরাজ আপন সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিবেন। দারার ভ্রাতাগণ পিতার শাসনে সম্মত ছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতার শাসনে সম্মত ছিলেন না; এই জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে যুদ্ধানল প্রজ্জলিত হইল।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দের শেষে বারাণসীর ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধক্ষেত্র শীত-কালের সায়ংকালের ঈষৎ আলোকে ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও মনুষ্যের শবরাশিতে ক্ষেত্র আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও মৃতদেহ সমুদায় পড়িয়া যেন আকাশের নক্ষত্রের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে; কোথাও মুমূর্ষু অবস্থায়• অঙ্গহীন শিপাহী ক্ষীণস্বরে "জল জল" উচ্চারণ করিতেছে; কোথাও দুই এক জন সেনা নিজ

ভ্রাতা বা বন্ধুর জন্য অনুসন্ধান করিতেছে,—হায়! তাহাদের এ জগতে আর ফিরিয়া পাইবে না। দুই এক জন তস্কর বহুমূল্য বস্ত্র বা স্বর্ণালঙ্কার বা অস্ত্রাদির অন্বেষণে ফিরিতেছে; ক্ষণে ক্ষণে পেচার ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, সন্ধ্যায় শৃগালগণ মহাকোলাহলে রব করিতেছে ও যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আসিতেছে; দুই এক স্থানে অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে ভীষণ আলোকচ্ছটায় ক্ষেত্র ও শবরাশি উজ্জ্বল করিতেছে; দূরে গঙ্গার পবিত্র জল কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে;—নদীর বিশাল বক্ষঃস্থল শান্ত, বিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল; ক্ষুদ্র মানবের সুখ বা দুঃখ, জয় বা পরাজয়ে বিচলিত হয় না।

ক্রমে রজনী গভীর হইল; চন্দ্র উদিত হইল; তাঁহার নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক কিরণে মানবের কি লজ্জা ও কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল; প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাগণ পরস্পরের শোণিতপানে লোলুপ হইয়া কত নরহত্যা করিয়াছে;—শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লুকও স্বজাতির উপর হিংসা করে না। সেই চন্দ্রালোকে দুই জন রাজপুত কোন বন্ধুর অনুসন্ধানে ক্ষেত্রে আসিয়াছিল। এক স্থানে কতকগুলি শব রাশীকৃত হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে যেন বেদনাসূচক স্বর বহির্গত হইল। রাজপুতসেনাগণ সেই শবরাশি উঠাইয়া দেখিল তাহার নীচে একজন যুবক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছে ও সেই ক্ষতস্থান হইতে অনবরত শোণিত নির্গত হওয়ায় অচেতন হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর আশু সম্ভাবনা নাই।

যুবকের আকৃতি দেখিয়া রাজপুত দুইজন বিস্মিত হইল। বয়ঃক্রম অতিশয় অল্প, বোধ হয় অষ্টাদশ বৎসরের অধিক নহে, মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর ও উজ্জ্বল, সেরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা স্ত্রীলোকের সম্ভবে; প্রায় পুরুষের সম্ভবে না। পরিশ্রম বা জীবনের চিন্তা বা বয়সের একটী রেখাও এ পর্য্যন্ত ললাটে অঙ্কিত হয় নাই; ললাট পরিষ্কার ও উন্নত। সমস্ত বদনমণ্ডল দেখিলে যোদ্ধা বলিয়া বোধ হয় না, বালক বলিয়া বোধ হয়; অথচ মুখের ভাব তেজ, গরিমা ও ঈষৎ ক্রোধ-ব্যঞ্জক।

রাজপুত সেনা দুই জনেরই যুদ্ধব্যবসায়ে হৃদয়ের স্বাভাবিক দয়া অনেক হ্রাস হইয়াছে, বালককে দেখিয়া তাহারা হাস্য করিয়া এইরূপে কথোপকথন করিতে লাগিল।

প্রথম সেনা। "এ বালক! এই বয়সেই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে?"

দ্বি, সেনা। "দেখিতেছি শাসুজার পক্ষের সেনা। বালক হইলেও সাহসী,—দেখ আমাদের রেখা পর্য্যন্ত আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছে এ কোন্ দেশের লোক ?"

প্র। "জানি না।"

দ্বি। "আমার বোধ হয় বঙ্গদেশের লোক, মোগল বা পাঠান হইলে এরূপ আকৃতি হইত না। আমার পিতামহ মানসিংহের সহিত বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি বলেন 'সেখানকার লোক সুখপ্রিয় ও বিলাসী, বিপদ দেখিলে না কি স্ত্রীলোক অগ্রসর হয়, স্বামী অঞ্চল ধরিয়া পশ্চাতে দাঁড়ায়।' সত্য মিথ্যা জানি না এইরূপ শুনিয়াছি।"

প্র। "হা হা হা! শাসুজা এই বাঙ্গালী শিশু লইয়া মহারাজ জয়সিংহ ও সলাইমানের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন? পুনরায় যখন আসিবেন আমরা যুদ্ধে না আসিয়া আমাদের বালকদিগকে পাঠাইয়া দিব।—চল এখানে আর কেন, আমাদের বন্ধুর অন্বেষণ করি।"

দ্বি। "এ লোক জীবিত আছে একটু সাহায্য করিলে বোধ হয় বাঁচিবে; ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাইব ?"

প্র। "শত্রুকে বাঁচাইতে গেলে আমাদের সময় থাকে না,—আমি এক দণ্ডে ইহার দফা শেষ করিতেছি।" এই বলিয়া অসি নিষ্কোষিত করিল। দ্বিতীয় সেনা তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল—

"না, না, মুমূর্ষু লোকের প্রাণনাশ করিতে আমাদের প্রভু মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নিষেধ করিয়াছিলেন, তুমি যাও আমি ইহাকে বাঁচাইব।"

প্রথম সেনা হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইল; দ্বিতীয় সেনা জলসেচনদ্বারা মুমূর্ষু যুবাকে জীবিত করিল। যুবা নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিল চারিদিকে শব পড়িয়া রহিয়াছে—আকাশে চন্দ্র উদয় হইয়াছে; যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধ। জিজ্ঞাসা করিল—

"বন্ধু, তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তোমার নাম কি,—কোন্ পক্ষের জয় হইয়াছে, শাসুজা কোথায় গিয়াছেন ?"

সেনা বলিল, "আমার নাম গজপতি সিংহ; তোমার সুজা অতিশয় কামিনীপ্রিয়, এতক্ষণ কামিনীদের বিচ্ছেদে পীড়িত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন; হা—হা!" পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিল, "যুবরাজ দারার পুত্র সুলতান সুলাইমান শেখের জয় হইয়াছে, তাঁহার সহচর মহারাজা জয়সিংহের জয় হইয়াছে। আমি রাজা যশোবন্ত সিংহের

অনুচর, তিনি কারণবশতঃ আমাকে রাজা জয়সিংহের নিকট পাঠাইয়াছিলেন সেই জন্য এক্ষণে তাঁহারই শিবিরে আছি। তোমার নাম কি, তুমি কোন্ দেশের লোক?”

যুবক অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া ভূমির দিকে অবলোকন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পর বলিল—“তুমি আমার শত্রু, কিন্তু আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, আমার পিতার স্বরূপ, আমাকে আর একটু সাহায্য কর। একটু জল দাও, একটু জল দাও, আর দুই এক দিন থাকিবার স্থান দাও। আমার দেশ অনেক দূর, বঙ্গদেশে, এখানে আমার একজনও বন্ধু নাই; আমার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জল দাও, জল দাও।”

নরেন্দ্রের বালকাকৃতি দেখিয়া গজপতি সিংহের দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল; তাহা না হইলে শত্রুর জন্য কে কারে যত্ন করে। বালকের কাতরোক্তি শুনিয়া আরও দয়া হইল। শুশ্রূষা করিয়া শিবিরে লইয়া যাইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজা জয়সিংহের শিবির।

একটী প্রকাণ্ড শিবিরের অভ্যন্তরে দুই জন মহাবীর বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, একজন রাজপুত রাজা জয়সিংহ, অপর জন তাঁহার পরম সুহৃৎ দেবের খাঁ, জাতিতে পাঠান।

রাজার বয়ঃক্রম অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনও মুখমণ্ডল যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ, শরীর যৌবনের বলে বলিষ্ঠ। সে সময়ে মোগল সম্রাটদিগের প্রধান সেনাপতি অধিকাংশই রাজপুত ছিলেন। রাজপুতদিগের বাহুবীর্য্যেই মোগলগণ সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। যেখানে ঘোর বিপদ বা ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত সেই স্থানেই রাজপুত সেনাপতি প্রেরিত হইতেন, ও প্রায়ই বিজয় লাভ করিয়া আসিতেন। আখ্যায়িকা বিবৃতকালে রাজপুতানার রাজাদিগের মধ্যে দুই জন বিশেষ ক্ষমতাশালী ও প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন, রাজা জয়সিংহ ও রাজা যশোবন্তসিংহ। সম্রাট্ শাজিহান উভয়কেই বিশ্বাস করিতেন ও বিপত্তির সময় ইহাঁদেরই রণে প্রেরণ করিতেন। সে সময়ে কি পাঠান, কি মোগল, কোন সেনাপতিরই জয়সিংহের ন্যায় প্রতাপ বা ক্ষমতা বা

রণকৌশল ছিল না। তাৎকালিক একজন বিচক্ষণ লেখক মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিযাছেন যে, জয়সিংহের মত কার্য্যদক্ষ লোক সে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে বোধ হয় আর কেহই ছিলেন না। শাজিহান ও যুবরাজ দারা যখন সুলাইমান শেখকে সুলতান সুজার বিরুদ্ধে পাঠান, সঙ্গে জয়সিংহকে তাঁহার রাজপুত সৈন্য সহিত পাঠাইয়াছিলেন। বারাণসীর যুদ্ধে সুজা পরাস্ত হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন। আধুনিক জয়পুর নগরী এই জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত, ও সেই নগরীতে ও দিল্লী, বারাণসী ও অন্যান্য স্থানে জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের আলোচনার জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মান-মন্দির অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবিরে উজ্জ্বল দীপাবলি জ্বলিতেছিল, বাহিরে সৈন্য, তাহার চারিদিকে অন্য শিবির। কিন্তু রাজার শিবিরেব মধ্যে আর কেহ ছিলেন না কেবল রাজা ও তাঁহার সুহৃৎ দেবের খাঁ গুপ্ত কথা কহিতেছিলেন।

দেবের খাঁ বলিলেন, "যথার্থই জয়সিংহ নাম পাইয়াছিলেন, আপনি যেস্থানে, জয় সেস্থানে।"

রাজা বলিলেন, "কেন অন্যের যুদ্ধের কথা বলিতেছেন। অন্য যুদ্ধ কোথায়? বঙ্গদেশের সেনার সহিত যুদ্ধ কি যুদ্ধ? বঙ্গদেশের সেনাগণ যেরূপ আরামপ্রিয় সেরূপ যুদ্ধপ্রিয় নহে; সুলতানসুজাও বঙ্গদেশে থাকিয়া রমণীপ্রিয় বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ!"

দে। "কেন যুদ্ধের সময় সুলতানসুজা অতিশয় সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করেন তাহা সকলেই স্বীকার করেন।"

রাজা। "তাহা স্বীকার করি। যুদ্ধের সময় তিনি প্রকৃত সাহসের পরিচয় দেন কার্য্যের সময় বিলাস বিস্মৃত হয়েন। কিন্তু কেবল সাহসে কি হয়, রণকৌশল জানেন না।"

দে। "আপনি আরংজীবকে কিরূপ মনে করেন?"

রাজা। "উঃ তাঁহার নাম করিবেন না, সেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আমি দেখি নাই, যেরূপ বীরত্ব সেইরূপ কৌশল। শুনিয়াছি তাঁহার গতি রোধ করিবার জন্য রাজা যশোবন্তসিংহ নর্ম্মদাতীরে যাইতেছেন। যশোবন্তসিংহ রাণার জামাতা ও সেইরূপ যোদ্ধা ও বিক্রমশালী, কিন্তু আরংজীবের সহিত যুদ্ধে কি হয় জানি না। যশোবন্তের সাহস আছে কৌশল নাই। আমার বোধ হয় এই ভ্রাতৃবিরোধে অবশেষে আরংজীবের জয় হইবে।"

দে। "আপনি দারাকে পরিত্যাগ করিবেন?"

রাজা। "ইচ্ছামতে কখনই নহে, কিন্তু যুদ্ধে যদি অবশেষে আরংজীবের জয় হয় তাহা হইলে তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা দিল্লীর সম্রাটের অধীন; যিনি যখন সম্রাট্ হইবেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা রাজবিদ্রোহিতা।"

দে। "ভাল, অদ্য আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সুজাকে বন্দী করিতে পারিতেন। সুজা যখন পলায়ন করিলেন আপনি অনায়াসে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারিতেন; তাহা হইলে যুবরাজ দারাও অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন; আপনি সেরূপ না করিলেন কেন?"

রাজা। "আপনি এতদূর দেখিয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিয়া সুলতান-সুজাকে পলাইতে দিয়াছি তাহা জানিয়াছেন; তাহার কারণ আছে। ভ্রাতায় ভ্রাতার যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ, যদি সুজাকে দারার সম্মুখে লইয়া যাইতাম, বোধ হয় যুবরাজ তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতেন, অথবা যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিতেন। তাহা কি বিধেয়? বিশেষ আমি এই যুদ্ধে আসিবার সময় সম্রাট্ শাজিহান যাহাতে যুদ্ধ না হয় এরূপ চেষ্টা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সুজার হানি করা তাঁহার ইচ্ছা নহে। সম্রাট্ আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার সন্তান সুজাকে বলিও এখন যুদ্ধ করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে, কোন ফললাভও হইবে না। আমি কালপ্রাপ্ত হইলে তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন; কি ততদিন যদি অপেক্ষা না করেন আরংজীব ও মোরাদের উদ্যম সফল হয় কি না দেখিয়া পরে যুদ্ধ করিতে পারেন।' সম্রাটের এই কথা অনুসারে আমি সন্ধি স্থাপনের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সুজাও একপ্রকার সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সলাইমান যুবা পুরুষ, আপন বিক্রম দেখাইবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া সহসা গঙ্গা পার হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এরূপ সময় এক জন সেনা আসিয়া বলিল—

"মহারাজ, এক জন সেনা গজপতি সিংহ একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহে।" রাজা বলিলেন, "আসিতে দাও," ক্ষণেক পর গজপতি সিংহ আসিয়া বলিল—

"মহারাজ, বঙ্গদেশের এক জন হিন্দু বন্দী হইয়াছে; সে আহত।"

রাজা বলিলেন," আমরা আহত লোকের সহিত যুদ্ধ করি না, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, স্বদেশে ফিরিয়া যাউক।"

গজপতি সিংহ—"মহারাজ, তাহার দেশ অনেক দূর, সে চলিতে অক্ষম, এদেশে তাহার বন্ধু বান্ধব কেহ নাই, নূতন আসিয়াছিল।"

রাজা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে আমার শিবিরে থাকিতে দাও, আরাম হইলে ছাড়িয়া দিও।"

নরেন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় একটী শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল।

পরে জয়সিংহ গজপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গজপতি, অদ্য তুমি যুদ্ধে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছ, সে জন্য তোমাকে ও তোমার প্রভু যশোবন্তসিংহকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। এক্ষণে কি গুপ্ত কথা বলিবার জন্য যশোবন্ত তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন নিবেদন কর।"

উভয়ে গুপ্ত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জেলেখা অভাগিনী।

তাহার পর কয়েক দিন নরেন্দ্রনাথ ভীষণ জ্বরে অচেতন অবস্থায় থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা হইত, বোধ হইত যেন তরীতে অতি দ্রুতবেগে গঙ্গার উপর দিয়া যাইতেছেন, পুনরায় কি দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন? বোধ হইত যেন এক অল্পবয়স্কা রমণী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে, আবার কি প্রাণের হেমলতাকে ফিরিয়া পাইলেন? রোগীর চক্ষে জল আসিল, শিরা স্ফীত হইল, ক্ষত হইতে রক্তধারা বহিতে থাকিল।

কয়েক দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। রোগের ক্রমশঃ উপশম হইল। যখন সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল, দেখিলেন এক অপূর্ব্ব কুটীরে একটী দীপ জ্বলিতেছে, তিনি একটী শয্যায় শুইয়া রহিয়াছেন। সে কুটীর কি তাঁহার পৈতৃক কুটীর?—না, এরূপ সুরম্য কুটীর তিনি কখনও দেখেন নাই। সমস্ত ঘর সুন্দর শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত ও স্বর্ণ ও রৌপ্যদ্বারা খচিত। সুবর্ণের শামাদানে দীপ জ্বলিতেছে ও সমস্ত গৃহ সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে। তাঁহার পালঙ্ক দ্বিরদরদ-খচিত, সুবর্ণ ও মণিদ্বারা বিভূষিত ও রক্তবর্ণ সাটীন দ্বারা মণ্ডিত। সম্মুখে একটী রৌপ্য আধারের উপর এক রৌপ্য পাত্রে জল রহিয়াছে, নীচে শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী বিচিত্র গালিচার উপর এক যবনকন্যা ও এক খোঁজা বসিয়া

অতি মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছে। যখন কন্যা যুবতী ও তন্বঙ্গী ও সুন্দরী, মুখে ও অবয়বে সৌন্দর্য্য ঝল্‌মল্‌ করিতেছে, নয়ন হইতে সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে, কেশপাশ হইতে সৌন্দর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছে। হেমলতার অবয়ব নরেন্দ্রের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল; কিন্তু এরূপ উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নরেন্দ্র কোথাও দেখেন নাই, এরূপ তেজস্কর গৌরব-বিস্ফারিত অবয়ব কখন দেখেন নাই। যবনকন্যার দৃষ্টিতে ও অঙ্গভঙ্গিতেই যেন তেজ ও দর্পের পরিচয় দিতেছে। যবনকন্যা এক একবার পীড়িত হিন্দুর দিকে চাহিতেছে, এক একবার বিষণ্ণভাবে ভূমির দিকে চাহিতেছে, আবার মৃদুস্বরে খোজার সহিত কথা কহিতেছে। খোজা কৃষ্ণবর্ণ ও বলবান্‌। তাহাদের কি কথা হইতেছিল নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল দুই একটা কথা শুনিতে পাইলেন।

যবনকন্যা বলিতেছিল—“মসরুর, কেন এ হিন্দুর ও আমার সর্ব্বনাশ করিবে? নির্দ্দোষী নিরাশ্রয় ব্যক্তির জীবননাশে কি তোমার আমোদ?”

মসরুর। “তবে তুমি কাফেরকে এস্থলে আনিলে কেন?”

জেলেখা। “সে যেন আমার দোষ; ইহাঁর কি দোষ? ইনিত নির্দ্দোষী।”

ম। “‘ইনি’ কি? নাম ধরিতে পার না—তোমার কেহ হন না কি? সেই জন্য এত মায়া?”

জেলেখা যোদ্ধাকন্যা; সহসা তাহার বদনে পৈতৃক ক্রোধ ও তেজের আবির্ভাব হইল; রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া যাইল। সক্রোধে বলিল —

“মসরুর যদি তুমি স্ত্রীলোক হইতে তাহা হইলে মায়ার কাতরতা বুঝিতে, যদি পুরুষ হইতে তথাপি হৃদয়ে কিছু দয়া থাকিত। তোমার পুরুষত্বের সহিত দয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, এক্ষণে এই প্রস্তর-শাণের অপেক্ষা তোমার হৃদয় কঠিন ও দুর্ভেদ্য।” মসরুর হাসিয়া বলিল, “ঐ দেখ কাফের উঠিয়াছে, আমি চলিলাম,” বলিয়া বাহিরে চলিয়া যাইল।

জেলেখা সহসা রোষ ত্যাগ করিয়া উঠিল, শয্যার দিকে আসিবার জন্যই উঠিল, কিন্তু ক্ষণেক স্থির হইয়া ভূমির দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন শরীর ঈষৎ কাঁপিতেছে ও ললাটে ঈষৎ ঘর্ম্ম দেখা যাইতেছে। উদ্বেগ সম্বরণ করিয়া জেলেখা ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া ক্ষত স্থান পরীক্ষা করিল। ক্ষত প্রায় আরাম হইয়াছে, জ্বরও গিয়াছে, কেবল শরীর দুর্ব্বল। নরেন্দ্রনাথ

বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, জেলেখার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শরীরের সমস্ত রক্ত বেগে ললাট, চক্ষু ও গণ্ডস্থল আপ্লুত করিল, আবার সহসা তিরোহিত হইল।

পূর্ব্বেই এই গৃহ ও শয্যা দেখিয়া নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন, কোথায় আসিয়াছেন, কে তাঁহাকে আনিল, কে সেবা করিতেছে। জেলেখাও মসরুরের কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন; এখন জেলেখার আচরণ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমি কোথা আছি,—এই কি বঙ্গদেশ,—আপনি কে,—আপনার নাম কি?"

নিঃস্তব্ধ নিশাযোগে সহসা বজ্রধ্বনি হইলে লোকে যেরূপ চমকিত হয়, জেলেখা সহসা নরেন্দ্রের এই প্রথম কথা শুনিয়া সেইরূপ চমকিত হইল।—কেন? কে বলিবে? কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়ে অঙ্গুলি স্থাপন করিল। নরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন—

"আমি অসহায় নিরাশ্রয়! আমি কোথায় আছি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

জেলেখা আবার ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিল। ক্ষণেক পর নরেন্দ্রনাথ অতিশয় ভীত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সুন্দরি! আমার বোধ হইতেছে আমি কোন বিপদে পড়িয়াছি, আমার হৃদ্‌কম্প হইতেছে—আমি অভাগা, জন্মাবধি অভাগা, আমাকে একটী কথা বলিয়া রক্ষা করুন, আমি কি নিরাপদে আছি?"

জেলেখা আবার অঙ্গুলি ওষ্ঠে স্থাপিত করিয়া সহসা মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন তিনি জেলেখার উজ্জ্বল চক্ষুতে জল দেখিতে পাইলেন। আর কোন প্রশ্ন করা বিফল বিবেচনায় নীরব হইয়া পড়িলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হায় আমার মত কে অভাগা!"

অস্পষ্ট প্রতিধ্বনির মত একটী শব্দ শুনিতে পাইলেন, "জেলেখা অভাগিনী!" একথা কি জেলেখা উচ্চারণ করিল? তাহা ত বোধ হয় না, জেলেখা ধীর পদসঞ্চরণে সেই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। তবে কি নরেন্দ্রনাথের আপনার শেষোচ্চারিত কথার প্রতিধ্বনি হইল? "জেলেখা অভাগিনী!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল ?

কয়েক দিবসের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু শারীরিক আরোগ্য হইলে কি হইবে, অন্তঃকরণ চিন্তায় ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সেই ঘরে কেবল মসরুর বা জেলেখা ভিন্ন কেহ আইসে না, কেহই কথা কহে না; মসরুরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া চলিয়া যায়, জেলেখা ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করে, অথচ স্পষ্ট বোধ হয়, জেলেখা তাঁহার দুঃখে দুঃখী, তাঁহার বিপদে বিপদাপন্ন। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন? সুলতান সুজা নরেন্দ্রনাথকে ভাল বাসিতেন, সুলতানই কি স্বয়ং আজ্ঞা দিয়া নরেন্দ্রের পীড়ার সময় সেবাশুশ্রূষা করাইতেছেন, সম্ভব বটে; রাজ-অট্টালিকা না হইলে এরূপ বহুমূল্য দ্রব্য কোথায় সম্ভবে? কিন্তু সুজা কাশীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন; নরেন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় হইয়া শত্রুহস্তে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অল্প অল্প স্মরণ ছিল। শত্রুরা কি অবশেষে তাঁহাকে বলি দিবার জন্য এইরূপ শুশ্রূষা করিতেছিলেন? তাহার কারণ কি; আর অসহায় নিরাশ্রয় একজন হিন্দুকে বলি দিয়া কোন্ পক্ষের কি লাভ হইবে? নরেন্দ্র কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

রজনী দ্বিপ্রহর, নরেন্দ্রনাথ একখানি দ্বিরদ-রদ-বিনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; সম্মুখে একটী দীপ জ্বলিতেছে, নরেন্দ্র হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

যখন চিন্তারজ্জু ছিন্ন হইল, একবার বদনমণ্ডল উঠাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন?—"অভাগিনী জেলেখা" নিঃশব্দে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জেলেখার মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয় পাণ্ডুবর্ণ, কেশপাশ আলুলায়িত, বদন বিষণ্ণ, নয়নদ্বয় জলে ছল্‌ছল্ করিতেছে। নরেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"রমণি! আপনি কে জানি না, আপনার মুখ দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে, আপনার কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলুন।"

জেলেখা উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে এক বিন্দু চক্ষুর জল মোচন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন—"আপনার হৃদয়ে বোধ হয় কোন বিষম দুঃখ জাগরিত আছে, যদি তাহা দূর করা আমার সাধ্যে থাকে, নিবেদন করুন, আমি যত্নের ত্রুটি করিব না।"

জেলেখা তথাপি নীরব, কিন্তু নরেন্দ্রের স্নেহসূচক কথা শুনিয়া তাহার নয়নদ্বয় হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। সে চক্ষু-জল মোচন করিয়া জেলেখা আপন হস্ত হইতে একটী অঙ্গুরীয় মোচন করিয়া নরেন্দ্রের নিকট স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন; নিশাযোগে এই সহসা সাক্ষাতের অর্থ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; তাঁহার বোধ হইল যেন কোন ঘোর সঙ্কট সন্নিকট। তিনি হস্তে গণ্ড স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; অন্যমনস্ক হইয়া সেই অঙ্গুরীয়টী হস্তে ধারণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা গৃহের দীপ নির্ব্বাণ হইল, ঘোর অন্ধকারে অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, অচিরাৎ যে আসনে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন তাহা উত্থিত হইতে লাগিল, হাত দিয়া দেখিলেন তাহার চারি কোণে রজ্জু, সেই রজ্জু দ্বারা আসন উপরে উত্থিত হইতেছে!

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সহসা উপরের ছাদে এক প্রকাণ্ড ছিদ্র দৃষ্ট হইল, সেই ছিদ্র হইতে রেখাকারে উজ্জ্বল আলোক আসিতে লাগিল। অচিরাৎ নরেন্দ্রের আসন উপরের ঘরে নীত হইল, ছিদ্র আবৃত হইল।

তখন নরেন্দ্র বিস্ময়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু সহসা অন্ধকার হইতে উজ্জ্বল আলোকে আনীত হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইলেন না, বরং সে আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন; অমনি শত নারী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত হাস্যধ্বনিতে সে উন্নত প্রাসাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নরেন্দ্র জীবনে কখনও এরূপ বিস্মিত হয়েন নাই। কোথায় আসিলেন, এ কি প্রকৃত ঘটনা না স্বপ্ন, এ কি পার্থিব না ঐন্দ্রজালিক ঘটনা? নরেন্দ্র পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন, পুনরায় উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় তাঁহার নয়ন ঝলসিত হইল, পুনরায় হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন, পুনরায় শত নারী-কণ্ঠ-ধ্বনিতে প্রাসাদ শব্দিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

ক্ষণেক পর যখন চাহিতে সক্ষম হইলেন, তখন যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময় দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। দেখিলেন মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত একটী উচ্চ প্রাসাদের মধ্যে তিনি আনীত হইয়াছেন। সারি

সারি প্রস্তরস্তম্ভ উচ্চ ছাদ ধারণ করিতেছে, সে ছাদে ও সে স্তম্ভে যেরূপ সুবর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্য্য দেখিলেন, সেরূপ তিনি জগতে কুত্রাপি দেখেন নাই। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সুগন্ধ পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে, নীচে স্তবকে স্তবকে পুষ্প রাশি করা রহিয়াছে, শত নারীকণ্ঠ হইতে পুষ্পমাল্য দোদুল্যমান হইয়া সুগন্ধে ঘর আমোদিত করিতেছে। ছাদ হইতে, স্তম্ভ হইতে, পুষ্প ও পত্ররাশির মধ্য হইতে সহস্র গন্ধদীপ নয়ন একেবারে ঝলসিত করিতেছে ও সেই সুন্দর উন্নত প্রাসাদ আলোকময় ও গন্ধপরিপূর্ণ করিতেছে। রেখাকারে শত রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই রেখার মধ্যস্থানে দীপালোকপ্রতিঘাতী, রত্নরাজিবিনির্ম্মিত উচ্চ সিংহাসনে আর একজন রমণী উপবেশন করিয়া আছে;—রমণী, না অপ্সরা? এ স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র আলফলায়লায় পড়িয়াছিলেন, যে এবনহাসেন নামক একজন দরিদ্র ব্যক্তি এক দিন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সহসা দেখিলেন, যেন তিনি বগদাদের কালিফ হইয়াছেন! নরেন্দ্রের স্বপ্ন তদপেক্ষাও বিস্ময়কর, তিনি যেন সহসা স্বর্গোদ্যানে আপনাকে অপ্সরাবেষ্টিত দেখিলেন!

নরেন্দ্র সেই অপ্সরা বা নারী-রেখার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহারা নিঃশব্দে রেখাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সকলেই বক্ষের উপর দুই হস্ত স্থাপন করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; দেখিলে যেন জীবনশূন্য পুত্তলির ন্যায় বোধ হয়। তাহাদের কেশপাশ হইতে মণিমুক্তা দীপালোক প্রতিহত করিতেছে; উজ্জ্বল বহুমূল্য বসন সেই আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে; তাহারা সকলেই যেন রাজ্ঞীর আদেশ-সাপেক্ষ হইয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সেই রাজ্ঞীর দিকে যখন চাহিলেন, নরেন্দ্র তখন শতগুণ বিস্মিত হইলেন। যৌবন অতীত হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ও উন্মত্ততা এখনও বিলীন হয় নাই; বোধ হয় যেন প্রথম যৌবনের বেগ ও লালিত্য ও লালসা বয়সে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্ঞীর শরীর উন্নত, ললাট প্রশস্ত, ওষ্ঠ ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, কৃষ্ণ কেশপাশ হইতে একটী মাত্র বহুমূল্য হীরকখণ্ড আলোকে ধক্‌ধক্ করিতেছে; নয়নদ্বয় তদপেক্ষা অধিক জ্যোতির সহিত উজ্জ্বল! মলমলের অবগুণ্ঠনে সে উজ্জ্বলতা গোপন করিতে অক্ষম। দেখিলেই বোধ হয়, নারী হউন বা অপ্সরা হউন, ইনি কোন অসাধারণ মহিলা, জগৎ বা স্বর্গপুরী শাসন করিবার জন্যই অবতীর্ণা হইয়াছেন।

কিন্তু নরেন্দ্রের এ সমস্ত দেখিবার অবসর ছিল না। সহসা যেন স্বর্গীয় বাদ্যযন্ত্র হইতে কোন স্বর্গীয় তান উত্থিত হইতে লাগিল, তাহার সহিত সেই শত অপ্সরার কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল। সেরূপ অপরূপ গীত নরেন্দ্র কখনও শুনেন নাই; তাঁহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, তিনি প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই গীত ক্রমে উচ্চতর হইয়া সেই উন্নত প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া উন্নত নৈশ গগনে বিস্তার পাইতে লাগিল; বোধ হইল যেন যথার্থই অদৃষ্ট নৈশ গগনবিহারী জীবগণ সেই গীতের সহিত যোগ দিয়া শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল! ক্রমে আবার মন্দীভূত হইয়া সে গীত ধীরে ধীরে লীন হইয়া গেল; আবার প্রাসাদ নিস্তব্ধ শব্দশূন্য! এইরূপ একবার, দুইবার, তিনবার গীতধ্বনি শ্রুত হইল, তিনবার সেই গীতধ্বনি ক্রমে লীন হইয়া গেল।

তখন রাজ্ঞী সজোরে পদাঘাত করায় সেই প্রাসাদের এক দিকের একটী রক্তবর্ণ যবনিকা পতিত হইল, নরেন্দ্র সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন; তাহার অপর পার্শ্বে চারি জন কৃষ্ণবর্ণ কুঠারহস্ত খোজা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করায় তাহাদের মধ্যে প্রধান একজন রাজ্ঞীর সিংহাসনপার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল; নরেন্দ্র দেখিলেন, সে—মস্‌রুর! নরেন্দ্রের ধমনীতে শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইল।

মস্‌রুর রাজ্ঞীর সহিত অনেকক্ষণ অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল, কি বলিতেছিল নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু কথা কহিতে কহিতে মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া নয়ন আরক্ত করিয়া যেন কি উত্তেজনা করিতে লাগিল। মস্‌রুর কি বলিতেছিল নরেন্দ্র তাহা জানিলেন না, কিন্তু তাহার আকৃতি ও ইঙ্গিত দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। রাজ্ঞীও সেই উত্তেজনাবাক্য শ্রবণ করিয়া নয়ন আরক্ত করিয়া পুনরায় সজোরে ভূমিতলে পদাঘাত করিলেন।

তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের অন্য পার্শ্বে একটী হরিদ্বর্ণ যবনিকা পতিত হইল; তাহার পার্শ্বে চারিজন পরিচারিকা হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দ্বিতীয় বার পদাঘাত করায় তাহার মধ্যে প্রধান একজন রাজ্ঞীর নিকট আসিল; নরেন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন সে পরিচারিকা—জেলেখা!

জেলেখা কি বলিল তাহা নরেন্দ্র শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহার আকার ও অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইল সে রাজ্ঞীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে, যেন কোন বন্দীর জীবনরক্ষার প্রার্থনা করিতেছে। সকলেই দেখিতে পাইল, সেই জেলেখার কথা শুনিয়া রাজ্ঞীর ক্রোধ ক্রমে লীন হইল; তাঁহার নয়ন ও ওষ্ঠে স্নেহ ও দয়ার চিহ্ন প্রকাশ হইল।

জেলেখাও বারবার নরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতে লাগিল ও রাজ্ঞী বারবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন; সে রূপরাশি দেখিলে কি নারী, কি অপ্সরা, সকলেরই চমকিত হওয়া সম্ভব। নরেন্দ্র স্বভাবতঃ গৌরবর্ণ, কিন্তু সম্প্রতি পীড়াবশতঃ তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া যেন অধিকতর সুন্দর বোধ হইতেছিল। নয়ন সেইরূপ জ্যোতিঃপরিপূর্ণ, ললাট সেইরূপ উন্নত, বদনমণ্ডল সেইরূপ উগ্র ও তেজঃব্যঞ্জক। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া নরেন্দ্র সাহসে নির্ভর করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; রক্তবর্ণ ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিয়া ভূমির দিকে একদৃষ্টিতে নিঃশব্দে চিন্তা করিতেছিলেন; কেবল এক একবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। এরূপ সাহসী অল্পবয়স্ক সুন্দর যুবার উন্নত ললাট ও প্রশস্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিলে কোন্ নারীর হৃদয় সহসা চমকিত না হয়?

রাজ্ঞী অবশেষে হাস্য করিয়া জেলেখাকে কি আদেশ করিলেন; সে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিল, "আমাদের জীবন মৃত্যু এক্ষণে তোমার আপনহস্তে, এক্ষণে সিংহাসনের নিকট যাইয়া নম্রভাবে আপন জীবনরক্ষা প্রার্থনা কর; রক্ষা পাইলেও পাইতে পার।" এই বলিয়া নরেন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া সিংহাসনের নিকট তাঁহাকে লইয়া গেল। নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, তিনি কি দোষ করিয়াছেন, কি বিপদে পড়িয়াছেন, কোথায় আছেন, স্বর্গে না পৃথিবীতে, তাহা জানেন না;—তিনি কি প্রার্থনা করিবেন?

সহসা রাজ্ঞীর বদনমণ্ডল ক্রোধে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইল; তিনি দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধভরে জেলেখাকে পদাঘাত করিলেন ও পুনরায় ইঙ্গিত করায় মস্‌রুর ও অন্য তিন জন কুঠারহস্ত খোজা আসিয়া নরেন্দ্রকে বেষ্টন করিল। রাজ্ঞী ক্ষণেক সরোষে নরেন্দ্রের বামহস্তের দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পরে সেই প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গেলেন। নরেন্দ্র আপন বামহস্তের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—জেলেখাদত্ত অঙ্গুরীয়।

একেবারে দীপাবলি নির্ব্বাণ হইল, সেই চারি জন খোজা ভিন্ন সকলেই ঘর হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইল, নিঃশব্দে অন্ধকারে সেই খোজাগণ রজ্জুদ্বারা নরেন্দ্রকে বন্ধন করিতে লাগিল।

অন্ধকারে কে নরেন্দ্রের মুখের নিকট একটী পাত্র ধারণ করিল, নরেন্দ্র বিস্ময় ও উদ্বেগে তৃষার্ত্ত হইয়াছিলেন,—সেই পাত্র হইতে পানীয় পান করিলেন; অচিরাৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর কি হইল তিনি জানিলেন না; কেবল বোধ হইল যেন সেই অন্ধকারে কে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সেই অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিল আর কে যেন অন্ধকারে করুণস্বরে রোদন করিতেছিল; তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, সে অভাগিনী জেলেখা!

নরেন্দ্রনাথ যখন জাগ্রত হইলেন তখন দেখিলেন সূর্য্য উদয় হইয়াছে, সূর্য্যের রশ্মিতে তিনি একটী প্রশস্ত বাজারের মধ্যে একটী পর্ণকুটীরের ধারে শুইয়া রহিয়াছেন, সূর্য্যের নবজাত রশ্মি তাঁহার মুখে পতিত হইয়াছে ও পথ, ঘাট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দোকান, বাজার, বস্তী আলোকময় করিয়াছে। এ কি সম্ভব?—এ কি বঙ্গদেশের রাজধানী রাজমহল? হইতে পারে, তাহা না হইলে এত লোকারণ্য কেন? তিনি আসিলেন কি প্রকারে? সুলতানসুজা কি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বারাণসী হইতে এই স্থানে আনিয়াছেন? গত নিশায় কি তিনি এই ভূমি-শয্যায় শুইয়া পীড়াবশতঃ প্রাসাদ ও পরীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন? না, এ সমস্ত ইন্দ্রজাল?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গজপতি সিংহ।

নরেন্দ্রের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে স্থানটী তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। সেই স্থান একটী প্রকাণ্ড সরাইয়ের মত বোধ হইল। মধ্যস্থানে একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহাব চারিপার্শ্বে দ্বিতল হর্ম্ম্য-শ্রেণী, প্রত্যেক কুঠরীতে দুই একটী করিয়া লোক আছে, সে সমস্ত লোক অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত পারস্য, উসবেক, পাঠান বা হিন্দু বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোক, প্রথমে নগরে আসিয়া এই সরাইয়ে বাসা করিয়া আছে। সকল লোক সরাইয়ে আসিলে নিশায় দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল;

এক্ষণে প্রাতঃকালে পুনরায় সরাইয়ের বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, লোকে সমাগমন করিতে লাগিল।

এক বৃদ্ধ পারস্যদেশীয় সেখ একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া তামাক্ খাই-তেছিল। নরেন্দ্র যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেখজী এটী কোন্ স্থান? আমি এখানে নূতন আসিয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" সেখজী বলিলেন—"বৎস, আমিও বাণিজ্যকর্ম্মে এই সহরে কল্য আসি-য়াছি, সহরের বিশেষ কিছু জানি না।" নরেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেখজী আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন, এই স্থানের নাম কি বলুন।" সেখজী উত্তর করিলেন—"আমি যথার্থই বলিতেছি এ সহরের কিছুই জানি না, তবে শুনিলাম এই স্থানটী বেগম সাহেবের সরাই, সম্রাটের জ্যেষ্ঠকন্যা পাদশা বেগম সহরের নূতন আগ-স্তুকের থাকিবার সুবিধার জন্য এই উৎকৃষ্ট সরাই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া-ছেন। আমি সুমরকন্দ ও বোখারা দেখিয়াছি, শীরাজ ও ইস্পাহান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর সহর দেখি নাই।" নরেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সহরের নাম কি? পাদশা বেগমই বা কে?" বৃদ্ধ বণিক অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"এ কাফের জ্ঞানশূন্য পাগল দেখিতেছি; পাগলটাকে তাড়াইয়া দাও, পাগলামি চড়িলেই এইক্ষণেই কি করিয়া বসিবে।" নরেন্দ্র গতিক মন্দ দেখিয়া সেস্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

দেখিলেন একজন পাঠান-স্ত্রী কতকগুলি ফলমূল লইয়া বিক্রয়ার্থ ধনী বণিকদিগের নিকট যাইতেছে। নরেন্দ্র তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিবি, এ সহরের নাম কি, এ স্থানকেই বা লোকে কি বলে?" বৃদ্ধা বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া পরে উত্তর করিল—"কাফের, আমার সে বয়স নাই, উপহাস করিতে হয় অন্য স্থানে যাও, এ খুবসুরৎ মুখ দেখিলে অনেক কঞ্চনীও ভুলিয়া যাইবে।" নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইলেন।

দেখিলেন একজন রাজপুত সৈনিক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, একজন ভৃত্য তাহার অশ্বের সেবা করিতেছে, সৈনিক সসজ্জ হইয়া ভৃত্যকে শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করি-লেন—"আমি নূতন এই স্থানে আসিয়াছি, এস্থানটীর নাম কি জানি না, আপনি বোধ হয় অনেক দিন আছেন, আমাকে একটু সহায়তা করুন।" সৈনিক উত্তর করিল—"আমার এমন অর্থ নাই যে তোমাকে সহায়তা

করি, তুমি যুবা পুরুষ, তোমার ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ হয় না, আমি তোমায় বয়সে সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, ইচ্ছা হয় তুমিও আইস, মহারাজ যশোবন্তের অধীনে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধের ন্যায় আর ব্যবসায় নাই, মহারাজের প্রসাদে আমাদের বিপুল মান্য ও সম্মান, আমরা যেখানে থাকি সেই আমাদের ঘর। কল্য দেশে ছিলাম, অদ্য রাজধানীতে আছি, আবার কল্য নর্ম্মদাতীরে যাইয়া মহারাজের প্রসাদে আরংজীব ও মোরদের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আনিব। সাহস হয় আইস, এই ব্যবসায় প্রবৃত্ত হও, সাহস না থাকে, চলিয়া যাও, রাজপুত ভীরুর সহিত কথা কহে না।" নরেন্দ্র সরোষে উত্তর করিলেন—"কেবল তুমিই যুদ্ধব্যবসায়ী এরূপ বোধ করিও না, আমিও যুদ্ধ করিয়াছি, কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমি পরাঙ্মুখ কি সম্মুখ আমার স্বদেশের সুবাদার তাহা জানেন। রাজপুত, আমি অর্থ ভিক্ষা করি নাই।"

রাজপুত অনেকক্ষণ নরেন্দ্রের দিকে দেখিয়া উত্তর করিলেন—

"বালক, তোমার মুখ আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি;—তুমি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছ না?—হাঁ, স্মরণ হইয়াছে,—তুমি আমাকে ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছ?"

নরেন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নরেন্দ্র তখন রাজপুতকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—

"না, বিস্মৃত হই নাই। গজপতি, তুমি কাশীর যুদ্ধের পর আমার জীবনরক্ষা করিয়াছ, জীবন থাকিতে আমি তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারি না; আমার সরোষ বাক্য মার্জ্জনা কর।"

দুই জনে অনেকক্ষণ আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। গজপতি বলিলেন যে,—"আমি মহারাজ জয়সিংহের নিকট হইতে কতিপয় পত্রাদি লইয়া আমার প্রভু মহারাজ যশোবন্তসিংহের নিকট যাইতেছি। তিনি আপাততঃ উজ্জয়িনীতে আরংজীবের সহিত যুদ্ধার্থে গিয়াছেন, যুদ্ধ না হইতে হইতেই আমি তথায় পঁহুছিতে পারিলেই মঙ্গল। তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমার সঙ্গে আইস, আমি মহারাজকে বলিয়া তোমাকে অশ্বারোহীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিব।" নরেন্দ্র সে দেশে বন্ধুহীন ও অর্থহীন, ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ক্ষণেক কথোপকথনের পর বলিলেন,—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উপহাস করিতেছি না,—আমি পীড়িত অবস্থায় এই স্থানে আসিয়াছি, আমাকে কে আনিয়াছে জানি না,—এসহরও কখন দেখি নাই,—ইহার নাম কি?"

গজ। "এসহরের নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ?" লোকে তোমাকে বাতুল মনে করিবে; এরূপ সরাই, ঐরূপ রাজবাটী তুল্য অট্টালিকাশ্রেণী আর কোথায় সম্ভবে? এ দিল্লীনগর।" "দিল্লীনগর?" এই কি দিল্লী? নরেন্দ্রনাথ না বঙ্গদেশে ছিলেন, এস্থানে তাহাকে কে আনিল, তিনি কবে আসিলেন, যথার্থই কি অপ্সরাগণ তাঁহাকে বঙ্গদেশ বা প্রয়াগ হইতে কল্য রজনীতে দিল্লী আনিয়াছে? নরেন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে দুইজনে দিল্লীনগরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন।

মহাভারতে বিবৃত ইন্দ্রপ্রস্থ নগর যে স্থানে ছিল, ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু সম্রাট্ ও মহম্মদ ঘোরীর প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথুরায়ের রাজধানী দিল্লীনগর যে স্থানে ছিল, এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ শাজিহান সেইস্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন ও সুন্দর প্রাসাদ, দুর্গ ও অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শাজিহানাবাদ নাম দেন। কিন্তু নগরের সে নাম কেহ জানে না; অদ্যাপি শাজিহানের নগর নূতন দিল্লী নামে বিখ্যাত। পৃথুরায়ের সময়ের হিন্দু নাম অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

দিল্লী—এক দিকে যমুনানদী ও অন্য তিন দিকে অর্দ্ধগোলাকৃতি-রূপে ইষ্টক ও মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত; সে প্রাচীর প্রশস্ত, ও দীর্ঘে ৪।৫ ক্রোশ, ও তাহার উপর দিয়া যাতায়াতের একটী পথ ছিল। যমুনাও এই প্রাচীরের মধ্যে দিল্লীনগর সন্নিবেশিত, কিন্তু প্রাচীরের বাহিরেও তিন চারিটী বৃহৎ বৃহৎ পল্লী ছিল ও ধনাঢ্য ওমরাহ ও হিন্দুরাজগণের অট্টালিকা ও বাগান অনেক দূর অবধি দেখা যাইত। দিল্লীর ভিতরে যমুনার অনতিদূরে পরিখা ও প্রাচীর-পরিবেষ্টিত দুর্গ আছে, দুর্গ ও নদীর মধ্যে কেবল একটী বিস্তীর্ণ বালুকাক্ষেত্র ছিল; এই বালুকাক্ষেত্রে রাজা ও ওমরাহগণ সময়ে সময়ে যুদ্ধাভিনয় করিতেন, দুর্গের ভিতর হইতে বেগমগণ তাহা দৃষ্টি করিতেন। আধুনিক দিল্লী সকলেই দেখিয়াছেন, পাঠক, চল, নরেন্দ্র ও গজপতির সঙ্গে আমরাও সপ্তদশ শতাব্দীর দিল্লী দর্শন করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করি।

গজপতি ও নরেন্দ্র দিল্লীর একটী প্রধান পথ দিয়া দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিল। সমস্ত দিল্লীই প্রায় সৈনিকের বাস, সে নগরে পঞ্চত্রিংশৎ সহস্রের অনধিক সৈন্য প্রায় কখনই নিবাস করিত না। সৈনিকগণের স্ত্রী, পরিবার ও বহুসংখ্যক ভৃত্য দিল্লীনগরে বাস করিত। তাহারা প্রায়ই মৃত্তিকা ও পর্ণকুটীরে বাস করিত, সুতরাং দিল্লী এইরূপ পর্ণকুটীরেই

পরিপূর্ণ। যে দিকে দেখা যায়, এইরূপ কুটীরশ্রেণীই অধিকাংশ দেখা যাইত। খাদ্যদ্রব্য বস্ত্রাদি বিক্রয়ার্থ যে দোকান ছিল তাহাও অধিকাংশ পর্ণকুটীর; সর্ব্বদাই অগ্নি লাগিত ও বৎসরে প্রায় বহু সহস্র পর্ণকুটীর একেবার দগ্ধ হইয়া যাইত। নরেন্দ্র দুই ধারে এইরূপ কুটীর দেখিতে দেখিতে চলিলেন। দোকানী পশারী নানারূপ দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে, পথ লোকারণ্য; অধিকাংশই অতি সামান্য লোক, অতি সামান্য বেশে নিজ নিজ কর্ম্মে যাইতেছে। দিল্লীতে এক্ষণে যেরূপ মধ্যশ্রেণী ব্যবসায়ী ও ও অন্যান্য লোক ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া নগর পরিপূর্ণ ও সুশোভিত করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। কেবল মহল্লোক বা ইতর লোক, প্রাসাদ বা পর্ণকুটীর ছিল। ইংরাজশাসনের পূর্ব্বে মধ্যশ্রেণী ছিল না।

যাইতে যাইতে নরেন্দ্র একটী বড় রাজপথে গিয়া পড়িলেন। সে পথে অনেকগুলি প্রশস্ত ও বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। মন্সবদার, কাজী, বণিক, ওমরাহ, রাজা প্রভৃতি মহল্লোকের হর্ম্ম্যশ্রেণীতে পথ সুন্দর দেখাইতেছে। নরেন্দ্র এরূপ সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী কোথাও দেখেন নাই, একটী বিস্তীর্ণ প্রাসাদের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া গজপতির সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র। "ঐ হস্তী আরোহণ করিয়া অত সমারোহে কে যাইতেছে জান?"

গজপতি। "উনি দিল্লীর মধ্যে একজন বড় বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাত, নাম দানেশমন্দ। বাদশা বড় ভাল বাসেন।" হস্তী ও আরোহী ও অনুচরবর্গ চলিয়া গেল।

ন। "আর ও কে যাইতেছে? আকৃতি পাঠানের ন্যায়, আরোহী যেমন তেজস্বী, অশ্বও যেন সেইরূপ তেজস্বী।"

গ। "জানি না দিল্লীর কোন প্রধান পাঠান ওমরাহ হইবেন।" অশ্বারোহী চলিয়া যাইল।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে উভয়ে প্রসিদ্ধ জমা মস্‌জীদ দেখিতে পাইলেন, ভারতবর্ষে সেরূপ মস্‌জীদ আর একটীও ছিল না। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সম্মুখে ঐ বৃহৎ অট্টালিকা কি?—যেন মস্‌জীদের মত বোধ হইতেছে, ওরূপ অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য আমি জন্মেও দেখি নাই।"

গ। "ও মস্‌জীদ্‌ই বটে, শুনিয়াছি উহা নির্ম্মাণ করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে। পর্ব্বতের উপরিভাগ সমতল করিয়া তাহার উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখ কেমন উহার আরক্ত বর্ণে নয়ন ঝলসাইয়া

যাইতেছে, তাহার উপর কেমন শ্বেতপ্রস্তরের তিনটী গম্বুজ উঠিয়াছে; এরূপ অট্টালিকা তোমাদের বঙ্গদেশে আছে? বাদশাহ যখন দিল্লীতে থাকেন স্বয়ং ঐ মস্‌জীদে প্রতি শুক্রবার যান,—সে যে সমারোহ যদি এক দিন দেখিতে কখনও ভুলিতে না। দুর্গ হইতে মস্‌জীদ পর্য্যন্ত চারি পাঁচ শত শিপাহী সার দিয়া দাঁড়ায়, তাহাদের বন্দুকের উপর হইতে সুন্দর রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতে থাকে। পাঁচ ছয় জন অশ্বারোহী পথ পরিষ্কার করিতে করিতে আগে যায়, পরে বাদশাহ হস্তীর উপর জাজ্বল্যমান এক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যান, তাহার পর কত ওমরাহ মনসবদার অপরূপ সজ্জা করিয়া যায় তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আর এস্থানে দাঁড়াইয়া কি হইবে, চল আমরা রাজবাটী দেখিগে। সেরূপ সুন্দর অট্টালিকা তোমাদের বঙ্গদেশে কি হিন্দুস্থানে নাই।” নরেন্দ্র সম্মত হইলেন, উভয়ে দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

দূর হইতেই রক্তবর্ণ উন্নত দুর্গপ্রাচীরের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ চমৎকৃত হইলেন। যত নিকটে আসিতে লাগিলেন ততই নয়ন আরও আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সে সময়ে ভারতবর্ষে যে দেশের যে লোক আসিয়াছেন দিল্লীর রাজবাটীর শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মতি মস্‌জীদ্, প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাবলীকে জগতের মধ্যে প্রায় অতুল্য বলিয়া সকলেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দুর্গপ্রবেশের স্থানে একটী বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ তাহার মধ্যে একজন হিন্দুরাজার শিবিরশ্রেণী রহিয়াছে, রাজা দুর্গের দ্বার রক্ষা করিতেছেন। চারিদিকে নানা দেশের নানা লোক আসিয়া উত্তমোত্তম দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়াদি করিতেছে। অশ্বারোহী ও ওমরাহগণ সর্ব্বদাই এদিক্ ওদিক্ যাতায়াত করিতেছেন, দুর্গের ভিতর হইতে শিপাহীগণ বাহিরে আসিতেছে আবার ভিতর যাইতেছে। সেরূপ জনাকীর্ণ ও সুন্দর স্থান প্রায় সহরের মধ্যে ছিল না। কত দেশের কত সহস্র লোক তথায় একত্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক তথায় সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেছে, ক্রয়বিক্রয়ার্থ সহস্র সহস্র ইতর লোক যেন নদীর স্রোতের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ ধাবিত হইতেছে।

দ্বারদেশে দুইটী প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীর আকৃতি, তাহার উপর দুইটী মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি। নরেন্দ্র উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ কাহার প্রতিমূর্ত্তি?” গজপতি বলিলেন—“আপনি হিন্দু, আপনি জানেন না? ইহাঁরা দুই জন রাজপুত বীরপুরুষ। চিতোরের জয়মল্ল ও পত্ত সম্রাট আকবরের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সেই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন;

পরে যখন আর পারিলেন না, অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিয়া যুদ্ধে হত হয়েন। পত্তের মাতাও বীররমণী ছিলেন, তিনিও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া হত হয়েন। তাঁহাদিগের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সম্রাট্ আকবর এই প্রতিমূর্ত্তি এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন।" পরে সগর্ব্বে গজপতি বলিলেন, "কিন্তু রাজপুত রাজাদিগের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতিমূর্ত্তির আবশ্যক নাই, যত দিন বীরত্বের গৌরব থাকিবে, রাজপুত নাম কেহ বিস্মরণ হইবে না। রাজপুতানার প্রত্যেক পর্ব্বত-শেখরে রাজপুতের বীরনাম খোদিত আছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক বেগবতী নদীতরঙ্গে রাজপুতের বীরনাম শব্দিত হইতেছে।" নরেন্দ্র ও গজপতি দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

প্রশস্ত পথ অতিবাহন করিয়া দুই জনে যাইতে লাগিলেন। পথের দুই ধারে অট্টালিকা তাহার উপর রাজ-কর্ম্মচারিগণ রাজকার্য্য করিতেছেন। দুর্গের দ্বারের বাহিরে যেরূপ হিন্দুরাজগণ দ্বার রক্ষা করিতেন, ভিতরে এই পথের উপর মন্‌সবদার ও ওমরাহগণ নিশাকালে দ্বার রক্ষা করিতেন। নরেন্দ্র সেই পথের নিকট দিয়া একটী পরিষ্কার জলের প্রণালী দেখিতে পাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন——

"এ জল কোথায় গিয়াছে?"

গ। "এই প্রণালী দিয়া যমুনার পরিষ্কার জল দুর্গের অভ্যন্তরে বেগমদিগের মহলে গিয়াছে। শুনিয়াছি প্রতি বেগমের গৃহের পার্শ্ব দিয়া এই জল গিয়াছে।"

ন। "ঐদিক্ হইতে কি গোলমালের শব্দ আসিতেছে, ওস্থানে কি হয়?"

গ। "ও স্থানে বড় বড় কারখানা আছে, রাজপরিবারের যে সমুদায় বিচিত্র বিচিত্র দ্রব্য আবশ্যক হয়, ঐ স্থানে প্রস্তুত হয়। এক স্থানে রেশমকার্য্যের কারখানা, অন্যস্থানে স্বর্ণকারদিগের, অপর স্থানে চিত্রকরদিগের, ছুতার, দরজী, চর্ম্মব্যবসায়ী, বস্ত্রব্যবসায়ী সকল প্রকার লোকের কারখানা আছে। দেশে যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কারিকর আছে, তাহারা প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত কার্য্য করে, মাসে মাসে বেতন পায়; ইচ্ছা হয়, চল কারখানায় যাই, কত অপরূপ দ্রব্য দেখিতে পাইবে।"

ন। "না আগে ঐদিকে যাই চল, ঐ অপূর্ব্ব উৎকৃষ্ট অট্টালিকা কি, চারিদিকে এরূপ সেনা, অশ্বারোহী, ওমরাহদিগের সমারোহ কেন?" দুই জনে সেইদিকে চলিলেন।

নরেন্দ্র উচ্চ ও সুরম্য প্রবেশদ্বারের উপর নাগরাখানা দেখিলেন। তাহার উপর বিংশতি বা ত্রিংশৎ জন বাদ্যকর দিবারাত্র সর্ব্বদাই রহিয়াছে ও প্রহরে প্রহরে বাদ্য করিতেছে। সে বাদ্য এত উচ্চ যে, নিশাকালে সমস্ত দিল্লীর লোক সেই গম্ভীর সুন্দর বাদ্য শ্রবণ করিতে পারিত। দ্বার দিয়া প্রবেশ করতঃ প্রাঙ্গণে আসিয়া নরেন্দ্র যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার নয়ন একেবারে ঝল্‌সাইয়া গেল। সম্মুখে জগদ্বিখ্যাত মর্ম্মর প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাসাদ "দেওয়ান খাস," সে প্রাসাদের ছাদ ও স্তম্ভ সুবর্ণ-দ্বারা মণ্ডিত ও রৌদ্রাতপে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। সেই প্রাসাদের ভিতরে সুবর্ণ ও হীরকখচিত দিবালোকপ্রতিঘাতী রত্নরাজী-বিনির্ম্মিত রাজ-সিংহাসনের উপর সম্রাট্‌ শাজিহান উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার গম্ভীর ও প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এখনও পীড়ার চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন নাই। পার্শ্বে দক্ষিণদিকে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বসিয়া রহিয়াছেন। ললাট ও বদনমণ্ডল সুন্দর ও প্রশস্ত, কিন্তু মুখে দুর্দ্দমনীয় দর্প, অভিমান ও তেজ বিরাজ করিতেছে। পিতার সম্মুখেও সে তেজ সম্পূর্ণ লীন হয় নাই। বামদিকে পৌত্র সুলতান সলাই-মান দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে, অবয়ব ও আকৃতি সুন্দর ও উন্নত। পশ্চাতে খোজাগণ ময়ূরপুচ্ছবিনির্ম্মিত চামর হেলাইতেছে। তাহার চারিদিকে রৌপ্যনির্ম্মিত রেল আছে, তাহার বাহিরে রাজা, ওমরাহ, মন্সবদার, দূত, সেনাপতি, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক অপরূপ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমির দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান্‌ হইয়া রহিয়াছে। সম্মুখস্থ সমভূমি লোকারণ্য। কি ধনী কি নির্দ্ধন, কি উচ্চ কি অধম সে স্থানে যাইয়া রাজাকে দর্শন করিবার সকলেরই অধিকার ছিল। সেই অপূর্ব্ব প্রাসাদে যথার্থই লিখিত রহিয়াছে, "যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে এই স্বর্গ, এই স্বর্গ, এই স্বর্গ।"—

সম্রাটের সম্মুখ দিয়া প্রথমে সুন্দর সুন্দর আরবদেশীয় অশ্ব চলিয়া গেল। পরে বৃহৎকায় হস্তীশ্রেণী পরিদর্শিত হইল, হস্তীগণ কর উত্তোলন করিয়া ও ভীষণ নাদ করিয়া বাদশাহকে "তস্‌লীম" করিয়া চলিয়া গেল। পরে হরিণ, বৃষ, মহিষ, গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সকল জন্তু ও তৎপরে নানারূপ পক্ষী একে একে পরিদর্শিত হইল, পরে কয়েক শত অশ্বারোহী লৌহবর্ম্মে মণ্ডিত হইয়া সদর্পে চলিয়া গেল। এই সমস্ত ও অন্যান্য অনেক প্রকার দৃশ্য দর্শন করিয়া নরেন্দ্র চমৎকৃত হইলেন।

এই সমুদায় হইয়া গেলে পর বাদশাহ দরখাস্ত গ্রহণ করিতে লাগি-লেন। কি নীচ কি উচ্চ সকলেই আসিয়া আসিয়া আপন আপন দুঃখ রাজাধিরাজ ভারতবর্ষের সম্রাটের নিকট জানাইতে লাগিল। সম্রাট দুই একটী আদেশ দিয়া সকলের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ যে বিষয়ে যে কথা বলিলেন, তৎক্ষণাৎ সকল প্রধান প্রধান ওমরাহ "কেরামৎ" "কেরামৎ" বলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

নরেন্দ্র এই সমস্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে রাজ-কার্য্য সমাধা হইয়া গেল; সম্রাট্পুত্র ও কয়েকজন প্রধান প্রধান ওম-রাহের সহিত "গোসলখানায়" গেলেন। "গোসলখানা" কেবল হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই; তথায় প্রধান প্রধান অমাত্য-দিগের সহিত রাজকার্য্যের গূঢ় মন্ত্রণাদি হইত। এদিকে রাজকার্য্য সমাধা হইল বলিয়া লোকরাশি আপন আপন গৃহে চলিল, নরেন্দ্রও নগরাভিমুখে যাইতে যাইতে গজপতিসিংহকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

ন। "সম্রাট্ কি সমস্ত মোকদ্দমার কার্য্য আপনি সমাধা করেন?"

গ। "না, অল্প অল্প বিষয় এইরূপে প্রত্যহ স্বয়ং দেখেন, বড় বড় মোকদ্দমায় দুইজন কাজীর সহিত বসিয়া সপ্তাহে একদিন বিচারকার্য্য করেন।"

ন। "পশ্চাতে ঐ উচ্চ প্রাচীর কিসের?"

গ। "ঐ প্রাচীরের পশ্চাতে রাজবাটীর বেগমদিগের ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে। শুনিয়াছি সে মহল অতিশয় চমৎকার। প্রত্যেক বেগ-মের ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে, তাহার চারিদিকে বাগান, ফোয়ারা, সুন্দর কুঞ্জবন, গ্রীষ্মকালে থাকিবার জন্য মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ঘর, নিশায় শয়নের জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ উচ্চ ছাদ ও স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত হর্ম্ম্যাদি আছে। কিন্তু সম্রাট্ ভিন্ন পুরুষের নয়ন সে সৌন্দর্য্য কখনও দেখে নাই, পুরুষের পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হয় নাই।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানা তাহার বালক।

এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে দুইজনে দুর্গের দ্বারের বহির্ভাগে পূর্ব্বোল্লিখিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন, সে স্থান তখনও জনাকীর্ণ।

বড় বড় লোক কেহ শিবিকায়, কেহ হস্তীর উপর, কেহ অশ্বারোহী হইয়া এদিকে ওদিকে যাতায়াত করিতেছে, শত শত ব্যবসায়ী লোক নানা অপরূপ ও বহুমূল্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে, তাহা ক্রয় করিতে বা দেখিতে সহস্র সহস্র লোক ব্যস্ত। কেহ বা গান করিয়া বা নৃত্য করিয়া অর্থলাভ করিতেছে, কেহ ভেল্কী দেখাইতেছে, কেহ সাপ দেখাইতেছে, কেহ হাত গণিয়া বলিতেছে। গণক বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেকেই তথায় আসিয়াছে। তাহারা সকলে রৌদ্রে আপন আপন জীর্ণ বস্ত্র পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এক দিকে একখানা যন্ত্র, আর এক দিকে একখানি করিয়া পুস্তক। অনেক লোক তাহাদের নিকট আসিয়া হাত দেখাইতেছে, কুলকামিনীরাও শুভ্র বসনে মণ্ডিত হইয়া ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে। প্রতিজন এক পয়সা করিয়া দিতেছে।

তাহাদের মধ্যে নরেন্দ্র এক অপরূপ গণক দেখিতে পাইলেন। তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হইবে না, মুখমণ্ডল অতিশয় কোমল, ও অতিশয় গৌরবর্ণ সূর্য্যাতপে আরক্ত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু ও গণ্ডস্থল ও স্কন্ধের উপর জটা পড়িয়াছে। জটা দ্বারা ঈষৎ আবৃত হইলেও চক্ষু হইতে তেজ যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে বাহির হইতেছে; অবয়ব ক্ষুদ্র ও কোমল অথচ তেজঃ-পরিপূর্ণ। মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর কৃষ্ণ বসনে আবৃত, কোমরে বহুমূল্য পেটী রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। বালক তাতারদেশীয় মুসলমান, কাহারও নিকট পয়সা না লইয়া হাত দেখিতেছে।

তাতার বালকের আকৃতি দেখিয়াই অনেকে তাহার নিকট যাইতেছে। গজপতি ও নরেন্দ্র উভয়েই তাহার নিকট গেল। গজপতি প্রথমে হাত দেখাইল ও জিজ্ঞাসা করিল, "অদ্য সন্ধ্যার সময়ই আমরা দিল্লীনগর পরিত্যাগ করিয়া যাইব, কোথায় যাইব বল দেখি?"

তাতার গজপতির মুখ ও বসন বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিল "মহারাজ যশোবন্তসিংহ নর্ম্মদাতীরে গিয়াছেন, তুমি সেইস্থানে যাইবে।"

গজপতি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "মহারাজ যশোবন্ত আরংজীবের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে; আর আমি রাজপুত অশ্বারোহী, আমার বসন দেখিয়া সকলেই বলিতে পারে, ইহার অধিক বলিবার তোমার বিদ্যা নাই?"

তাতার প্রজ্জ্বলিত নয়নে গজপতির উপর স্থির দৃষ্টি করিয়া ক্ষণেক পর মস্তক নাড়িয়া জটাভার পশ্চাৎ দিকে ফেলিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল—

"রাজপুত! আরও বলিতে পারি, আরংজীবের হস্তে সমস্ত রাজপুতের নিধন হইবে। মহারাজকে বলিও যেন দ্রুতগতি একটী অশ্ব বাছিয়া লয়েন, নতুবা পলাইবার সময় পাইবেন না। সপ্ত সহস্র রাজপুতের মধ্যে সপ্ত শতেরও রক্ষা নাই। রাজপুত! সে যুদ্ধে তোমার নিশ্চয় নিধন।"

গজপতি সাহসী যোদ্ধা, কিন্তু তাতার বালকের আকার বা গম্ভীর স্বর বা প্রজ্জ্বলিত চক্ষু দেখিয়া ও এই কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, শরীরের শোণিত চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে ভাব অন্তর্হিত হইল, অতিশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"ক্ষতি নাই, যদি জগদীশ্বর ললাটে তাহাই লিখিয়া থাকেন, মহারাজের রক্ষার্থ হৃদয়ের শোণিতদান অপেক্ষা রাজপুত অধিকতর গৌরবের কার্য্য জানে না।"

সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে নরেন্দ্র আপন হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি আমার নাম কি?"

বালক বলিল "নরেন্দ্রনাথ।" সকলে বিস্মিত হইল। নরেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি যদি যথার্থ হাত দেখিতে জান, বল দেখি কল্য নিশাকালে আমি কাহাকে দেখিয়াছিলাম?"

তাতার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি এক অপূর্ব্ব গৃহে এক অপূর্ব্ব পালঙ্কে ছিলেন, একটী নারীকে দেখিয়াছিলেন, সে কে, স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি বালক, গণনাবিদ্যা সম্পূর্ণ শিখিতে পারি নাই—বোধ হয় সে নারী কোন অভাগিনী হইবে।"

সকলে হাসিয়া উঠিল "না, না, সে নারী বড় সৌভাগ্যবতী, না হইলে সেই অপূর্ব্ব পালঙ্কে এ অপূর্ব্ব সুপুরুষ পাইল কিরূপে?" এইরূপ বলিতে বলিতে সকলে হাসিয়া গোল করিয়া উঠিল।

নরেন্দ্রনাথ হাসিলেন না, গোল করিলেন না, তাতারের কথা শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর তাতার নরেন্দ্রকে একদিকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে গুপ্তভাবে বলিল—

"মহাশয়, আমি আপনাকে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি, এই কোমরে যে পেটী দেখিতেছেন ইহাতে আমার ধনের পরিচয় দিতেছে। তথাপি আমি ফকীর দেওয়ানা, পীরের কাছে পণ করিয়াছি যাবজ্জীবন দেওয়ানা ফকীর থাকিব। আপাততঃ দিল্লীতে আমার মহা বিপদ, আমার

জীবনের সংশয়, আপনি যুদ্ধে যাইতেছেন, আপনার কাছে যাচ্ঞা, এই ফকীরকে সঙ্গে রাখিবেন, দেওয়ানাকে নিকটে স্থান দিবেন। দেওয়ানা আপনার অপকার করিবে না, উপকার করিবার চেষ্টা পাইবে।”

শেষ কথাগুলি অতিশয় করুণস্বরে উচ্চারিত হইল। নরেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন দেওয়ানার চক্ষে একবিন্দু জল। ইতিপূর্ব্বে তাতারের তেজঃ-পরিপূর্ণ বাক্যে রাজপুতও কম্পিত হইয়াছিল, সহসা সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার করুণস্বরে নরেন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। তাতার বোধ হয় যথার্থই জ্ঞানশূন্য দেওয়ানা। নচেৎ এরূপ ভাব পরিবর্ত্তন কেন? নরেন্দ্র পারশীপুস্তকে অনেক রাজপুত্রের কথা পড়িয়াছিলেন, যে তাহারা অল্পবয়সেই রাজ্য ও সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ফকীরি গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন। এই তাতার বালকও কি সেইরূপ? অল্পবয়সে অতিশয় কষ্ট সহ্য করিয়া কিছু পরিমাণে জ্ঞানশূন্য হইয়াছে? হইতে পারে। ভাবিয়া চিন্তিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাকে নিকটে রাখিতে সম্মত হইলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার সময়েই গজপতি, নরেন্দ্র ও তাতার বালক দিল্লী ত্যাগ করিয়া নর্ম্মদাভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাজা যশোবন্ত সিংহের শিবির।

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বসন্তকালে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর ও তরঙ্গবাহিনী সিপ্রানদীর অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিল। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল কিরণে সিপ্রানদীর উভয় কূলে যতদূর দেখা যায়, শুভ্র শিবিরশ্রেণী দেখা যাইতেছে। একদিকে রাজা যশোবন্ত ও তাঁহার সহযোদ্ধা কাসেম খাঁর অসংখ্য সেনা চন্দ্রকরোজ্জ্বল শিবিরশ্রেণীর মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে, অপর তীরে এক পর্ব্বতোপরি আরংজীব ও মোরদের মোগল সৈন্য রহিয়াছে; মধ্যে কলকলনাদিনী সিপ্রানদী প্রস্তরশয্যার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, যেন দুই পার্শ্বস্থ ভীমদর্শন পর্ব্বতের ক্রোধদৃষ্টিতে ভীত না হইয়া উপহাস করিয়া যাইতেছে। দূরে ভারতবর্ষের কোটীবন্ধনস্বরূপ বিন্ধ্যপর্ব্বত চন্দ্রালোকে দেখা যাইতেছে। কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে কিন্তু অদ্য সমস্ত জগৎ সুপ্ত। কেবল সময়ে সময়ে প্রহরীর স্বর নিস্তব্ধ রজনীতে সুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে; কেবল সিপ্রানদীর তরঙ্গমালা কলকল

করিতেছে ; কেবল দূর হইতে নৈশ শৃগালের শব্দ নদীকূলে ও পর্ব্বত-শ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

একটী শিবিরে নরেন্দ্র শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রিত আছেন, তথাপি যুদ্ধের নানারূপ চিন্তা স্বপ্নরূপে তাহার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে। সিপ্রানদীর কল্‌কল্‌ নাদ যেন ভাগীরথীর শব্দ বোধ হইল ; সেই ভাগীরথীতীরে সেই কুঞ্জবন-বেষ্টিত উচ্চ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তীরে বালুকারাশি ; বালুকা-রাশিতে দুইজন শিশু ক্রীড়া করিতেছে, আর একজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে প্রেমপুত্তলী কে ? সে কোথায় ? ভাগীরথীতীরস্থ কুঞ্জবনে সেই তিনটী শিশু রজনীতে ক্রীড়া করিত সত্য ; কিন্তু কালের নিষ্ঠুর গতিতে সে চিত্রটী বিলুপ্ত হইয়াছে।

স্বপ্ন পরিবর্ত্তিত হইল ; ভাগীরথীর কল্লোল নহে, এ রমণীর গীতধ্বনি, রমণী না অপ্সরা ? উচ্চ প্রাসাদ, তাহার ছাদ ও স্তম্ভ সুবর্ণ ও রৌপ্য-মণ্ডিত, তাহার মধ্যে এক অপ্সরা গান করিতেছে। কেবল একজন অপ্সরা গান করিতেছে, সে বড় দুঃখের গীত, অভাগীর গীত, "অভাগিনী জেলেখা" কাঁদিয়া কাঁদিয়া গীত গাইতেছে। নরেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন— ঐ যে জেলেখা দাঁড়াইয়া আছে ; ঐ যে তাহার রত্নরাজি-বিভূষিত কেশ-পাশে উজ্জ্বল বদনমণ্ডল কিঞ্চিৎ আবৃত রহিয়াছে, ঐ যে তাহার প্রজ্জ্বলিত নয়নদ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু জল পড়িতেছে ; একি স্বপ্ন ? স্বপ্নে কি এরূপ স্পষ্ট দেখা যায় ? নরেন্দ্র আবার চক্ষু মুছিলেন, এবার শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন।

কৈ জেলেখা ত নাই ! কিন্তু সে সুন্দর সুমধুর হৃদয়বিদারক গীতধ্বনি এখনও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। যে ব্যর্থ প্রেম করিয়া প্রেমের প্রতিদান পায় নাই, না পাইয়া পাগল হইয়াছে ও জগতে উদাসীন হইয়া দেশে দেশে বেড়াইতেছে, তাহারই এই গান সম্ভবে। গান শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রের চক্ষুতে জল আসিল, শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে যাইলেন। কৈ অপ্সরা কৈ, জেলেখা কৈ ? জগৎ নিস্তব্ধ, দ্বিপ্রহর নিশার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে, চন্দ্রকিরণে নদী, পর্ব্বত, শিবির ও মাঠ দৃষ্ট হইতেছে ;—আর সেই অভাগা দেওয়ানা তাতার বালক শিবিরদ্বারে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে ; স্বপ্তস্বরমিলিত সে গান বায়ুতে বাহিত হইয়া নৈশ গগনে উত্থিত হইতেছে ও চারিদিকে আকাশে বিস্তৃত হইতেছে।

নরেন্দ্র সাশ্রুনয়নে বালকের হস্তধারণ করিয়া তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি যথার্থই প্রেমের জন্য দেওয়ানা হইয়াছ? তোমার হৃদয়ে কি কোন গভীর দুঃখ আছে? তাহা না হইলে এই ঘোর রজনীতে একাকী জাগরণ করিয়া এই দুঃখ গান করিতেছ?"

বালক একদৃষ্টিতে নরেন্দ্রের দিকে চাহিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, ললাট হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইতে লাগিল। ক্ষণেক পর হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে করুণস্বরে বলিল—

"মার্জ্জনা করুন, আমি দেওয়ানা, আমার জ্ঞান নাই, যখন যাহা মনে আইসে তাহাই গান করি।" নরেন্দ্র অনেক প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করিয়া বার বার তাহার দুঃখের কারণ ও এই অল্প বয়সে ফকিরী গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক তাহার উত্তর দিল না, কেবল বলিল "আমি দেওয়ানা।"

নিশা অবসানে নরেন্দ্র রণসজ্জা করিয়া আপন বন্ধু গজপতি সিংহের শিবিরে গেলেন, দেখিলেন তিনিও যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, আপন তরবারি, চর্ম্ম, বর্ষা প্রভৃতি স্বয়ং শানাইতেছেন; অস্ত্রগুলি রৌপ্যের মত উজ্জ্বল হইয়াছে, তথাপি আরও উজ্জ্বল করিতেছেন। দেখিয়া নরেন্দ্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন; পরে শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিলেন গজপতি সমস্ত রাত্রি শয়ন করেন নাই, সমস্ত রাত্রিই এই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুদ্বয় ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত। কেন? নরেন্দ্র গত কয়েক দিন অবধি গজপতির যে ভাব গতিক দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কারণ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলেন। দেওয়ানা বালক হাত দেখা অবধি গজপতি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন উজ্জয়িনীর যুদ্ধে তাঁহার নিধন হইবে। বোধ হয় গত নিশায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, শয়নের অবসর পান নাই।

পাঠক, গজপতিকে ভীরু মনে করিতেছ? রাজপুত সকলেই সাহসী, তথাপি তাহাদের মধ্যেও গজপতি অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না। তথাপি কল্য নিশ্চয় মৃত্যু জানিলে সাহসীর ললাটও চিন্তারেখায় অঙ্কিত হয়। যোদ্ধা যৌবনমদে মত্ত থাকিয়া, জীবনের সুখে মগ্ন থাকিয়া, যুদ্ধের উৎসাহে প্রফুল্ল থাকিয়া, জয়ের আশায় আশ্বস্ত হইয়া, মৃত্যুর চিন্তা দূর করে; যুদ্ধ তাহাদের পক্ষে আমোদমাত্র, অনেক লোক মরিতেছে, তাহারাও এক দিন মরিবে, তাহাতে ক্ষতি কি। কিন্তু "কল্য মরিবে"

বজ্রধ্বনিতে যদি এই শব্দ সহসা হৃদয়ে আহত হয়, তাহা হইলে সে উৎসাহ সে প্রফুল্লতা একবারে হ্রাস পায়। গজপতি সে সময়ের সকল লোকের ন্যায় গণনবিদ্যায় দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, অদ্য যুদ্ধে তিনি মরিবেন তাহা তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, গত রজনীতে অনিদ্র হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অস্ত্র পরিষ্কার করা কেবল কাল কাটাইবার একটী উপায়মাত্র।

নরেন্দ্র আসিবামাত্র গজপতি উঠিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি অস্ত্রগুলি পরিষ্কার হইয়াছে কি না।" শুষ্কবদনে সে হাসি বিকট বোধ হইল।

নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "যথার্থই কি আপনি অদ্য যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন? দেওয়ানা ফকীরের কথা স্মরণ করুন।"

গজপতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সম্মুখে রণ রাখিয়া রাজপুত কখনও পশ্চাতে চাহে না।" রাজপুতের নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল।

নরেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; ক্ষণেক পর গজপতি আবার বলিতে লাগিলেন—

"নরেন্দ্র, আমার যুদ্ধ করিবার অন্য একটী কারণ আছে,—আমার ললাটের লিখন অদ্য মানবলীলা সম্বরণ করিব।"—নরেন্দ্র আবার নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তখন ধীরে ধীরে রাজপুত বলিতে লাগিলেন—

"নরেন্দ্র, আমি যে দিন তোমার কোমল আকৃতি দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া কাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার জীবনরক্ষা করি,—জানি না কেন,—সেই দিন হইতে আমি তোমাকে কনিষ্ঠের মত ভাল বাসি, তোমার প্রতি আমার মায়া যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছে। নরেন্দ্র, তোমার ভ্রাতাকে বিদায় দাও।" নরেন্দ্রের চক্ষুতে জল আসিল।

গজপতি আরও বলিলেন "নরেন্দ্র, এক যুদ্ধে আমি মহারাজ যশোবন্ত-সিংহের উপকার করিয়াছিলাম; রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই মুক্তা-হার প্রদান করেন। সেই অবধি সকল যুদ্ধেই আমি এই হার ললাটে পরিধান করিয়াছি। অদ্যকার যুদ্ধে তুমি নিস্তার পাইবে, এই হার রাজাকে দিও এবং বলিও দেশে আমার দুইটী শিশু-সন্তান আছে, হত-ভাগাদের মাতা নাই। মহারাজকে বলিও যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহা-দিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করেন, বালক রঘুনাথও কালে রাজার আজ্ঞায় পিতার ন্যায় সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয় ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গল ইচ্ছা তাহার পিতা জানে না।"

নরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, নয়ন দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গজপতির নয়নদ্বয় শুষ্ক ও অতিশয় উজ্জল!

সহসা ভেরী-শব্দ শুনা যাইল, মোগলেরা সিপ্রানদী পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে। গজপতি রণসজ্জা পরিধান করিয়া বাহিরে আসিয়া লম্ফ দিয়া অশ্ব আরোহণ করিয়া তীরবেগে নদীমুখে চলিলেন।

নরেন্দ্রও নির্গত হইয়া যুদ্ধাভিমুখে চলিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মোগলশিবির।

যুদ্ধের পূর্ব্বনিশায় রাজপুত-শিবির পাঠক দর্শন করিয়াছ; একবার সেই নিশায় মোগল-শিবির দর্শন কর।

আরংজীব পূর্ব্বেই সেইস্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, মোরাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুই তিন দিন পর মোরাদ সসৈন্যে আরংজীবের সহিত যোগ দিলেন, এই দুই তিন দিনের মধ্যে যদি যশোবন্তসিংহ আরংজীবকে আক্রমণ করিতেন, আরংজীব অবশ্যই পরাস্ত হইতেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, আরংজীবের অল্পমাত্র সৈন্য আছে এ কথা যশোবন্ত জানিতেন না, সেইজন্যই আক্রমণ করেন নাই; আবার কেহ কেহ বলেন, মহানুভব রাজপুত সেনাপতি সে কথা জানিয়াও অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা রীতিবিরুদ্ধ, এই জন্যই অপেক্ষা করিয়াছিলেন। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে যশোবন্তের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা অতি বিরল।

আজি আরংজীব ও মোরাদ দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কালি যুদ্ধ হইবে। জয়জয়নাদে শিবির পরিপূর্ণ হইল। পট্টবস্ত্রমণ্ডিত উৎকৃষ্ট দীপালোকশোভিত প্রশস্ত শিবিরে দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিয়াছেন; চারিদিকে জগদ্‌বিমোহিনী নর্ত্তকী ও গায়কীগণ নৃত্যগানাদি করিয়া রাজপুত্রদ্বয়ের মনোরঞ্জন করিতেছে। মোরাদের প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, বীর-আকৃতি, অকপট হৃদয়; আরংজীবের ললাট কুঞ্চিত, তীব্রদৃষ্টি, মনের গভীর কুটিলতা দুর্ভেদ্য, মন সর্ব্বদাই সহস্র চিন্তায় অভিভূত; তথাপি কি সুন্দর সরল হাসিই হাসিতেছেন, কি সম্মানের সহিত মোরাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, যেন ভ্রাতাকে দেখিয়া তিনি আর আনন্দ

রাখিতে পারিতেছেন না, যেন ভ্রাতার কার্য্যসাধন অপেক্ষা তাঁহার জগতে অন্য আমোদ বা অন্য উদ্দেশ্য নাই।

ভোজন সাঙ্গ হইল, ভৃত্যেরা ফল ও মদিরা লইয়া আসিল; গায়কীগণ পুনরায় সপ্তস্বরে গান আরম্ভ করিল, শিবির আমোদিত হইল, কেশের হীরকের সহিত কটাক্ষদৃষ্টির জ্যোতিঃ মিশাইয়া যাইতে লাগিল; সুললিত গানের সহিত সুমিষ্ট হাস্যধ্বনি মিশাইয়া যাইতে লাগিল, মোরাদ একবারে বিমোহিত হইলেন।

আরংজীব সুবর্ণপাত্রে মদিরা ঢালিয়া মোরাদের হস্তে দিয়া বলিলেন—

"আজি সেবায় আপনাকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছি, আজ আমার জীবন সার্থক।"

মোরা। "আরংজীব, আপনার ন্যায় অমায়িক ভ্রাতা আমি পাইব না। একটু মদিরা আপনার জন্য লউন্।"

আরং। "ক্ষমা করুন, আপনি জানেন আমার জীবনে সুখের বাঞ্ছা নাই; হৃদয়ে বড় মানস আছে, আপনার মত বীরপুরুষকে পিতৃসিংহাসনে একবার দেখিব, ইহা ভিন্ন আর ইচ্ছা নাই; পৈগম্বর যদি এই এরাদা সফল করেন তাহা হইলে সন্তুষ্টমনে ফকিরী গ্রহণ করিয়া মক্কায় যাইব।" এই বলিয়া আর এক পাত্র মদিরা দিলেন।

মোরা। "আরংজীব, আপনি যথার্থই ধার্ম্মিক, তাহা না হইলে আমার জন্য আপনি এরূপ যত্ন করিবেন কেন?"

আরং। "কাহার জন্য করিব? তৈমুরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার উপযুক্ত আর কে আছে? সুজা বিলাসপ্রিয়, ভীরু, সুজা আকবরের সিংহাসন কলঙ্কিত করিবে? আত্মাভিমানী মূর্খ কাফের দারা আকবরের সিংহাসন কলুষিত করিবে! তাহা অপেক্ষা পুনরায় হিন্দুস্থান কাফেরদের হস্তে যাউক, তৈমুরের নাম বিলুপ্ত হউক! ইহাদের জন্য আমি যুদ্ধ করিব না; যাঁহার সাহস অপরিসীম, যাঁহার যশোরাশিতে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছে, যিনি মোগল সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ, মোগলকুলে কুলতিলকস্বরূপ, তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিব;—আমি আপনার সম্মুখে আপনার সুখ্যাতি করিতে চাহি না, কিন্তু যখন আমি আপনাকে দেখি, আমার যথার্থই বোধ হয় যেন আপনার উদার ললাটে "সম্রাট্" শব্দ খোদিত রহিয়াছে, আপনার বিশাল বক্ষঃ ও দীর্ঘ বাহুতে "যোদ্ধা" শব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে; আমার জীবন ধন্য, যে এইরূপ বীরপুরুষের কার্য্য-

সাধনে আমি লিপ্ত হইয়াছি।” সুবর্ণপাত্র আর একবার মদে পরিপূর্ণ করিলেন।

মোরা। “আরংজীব, আমি যথার্থই আপনার বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম, কাল যুদ্ধ হইবে, সৈন্য সকল প্রস্তুত আছে?”

আরং। “আমি তিন চারি দিন হইতেই প্রস্তুত আছি, কিন্তু যুদ্ধ-ব্যবসায়ে আমি এখনও অপরিপক্ক, একাকী সাহস হয় না; আপনি নিকটে থাকিলে আমার যেন বোধ হয় আমি পর্ব্বত-পার্শ্বে নিরাপদে আছি, আমার সাহস দ্বিগুণ হয়।”

মোরাদ একরূপ আত্মাভিমানী ছিলেন, যে প্রবঞ্চনা এবং চাটুকার বাক্যও সত্য বলিয়া জ্ঞান হইত, বিশেষ এক্ষণে অধিক মদিরাসেবনে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। আরংজীবের প্রশংসাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

“ভ্রাতা, আপনিও কালে রণপণ্ডিত হইবেন, এক্ষণে কিছুদিন আমার উপর নির্ভর করুন। আর আমি,—আমি জগতে কাহারও উপর নির্ভর করি না, কেবল আমার সাহস ও এই অসির উপর ভরসা করি।”—বলিয়া অসি নিষ্কোষিত কবিলেন; দীপালোকে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। পুনরায় অসি কোষে রাখিতে গেলেন, কিন্তু অতিশয় মদিরাসেবনে দৃষ্টি স্থির ছিল না, অসি মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইল। চতুঃপার্শ্বে সুন্দরীগণ ঈষৎ হাসিল, কিন্তু আরংজীব তীব্র দৃষ্টিপাত করায় তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। আরংজীব আর এক পাত্র মদিরা দিলেন, মোরাদ তাহাও শেষ করিলেন।

আরংজীব বলিলেন “ভ্রাতা, তবে বিদায় হই, কাল রণক্ষেত্রে আবার আপনার দর্শন পাইব।”

মোরা। “যাও, আরংজীব যাও, আমি আপনার উপর বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম, আইস আলিঙ্গন করি।” এই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইয়া ভ্রমবশতঃ একজন রমণীর গলায় হস্ত দিয়া আলিঙ্গন করিলেন; রমণীমণ্ডলী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, আরংজীব সরিয়া যাইলেন। মোরাদ সেই রমণীকে ক্রোড়ে লইয়া ঢলিয়া পড়িলেন।

আরংজীব পার্শ্বস্থ শিবিরে যাইলেন, ভ্রাতাকে যে সহাস্য মুখ দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তিত হইল, মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, ললাটে দুই তিনটী ভীষণ রেখা অঙ্কিত হইল; অন্ধকারে নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে এক একবার হঠাৎ দণ্ডায়মান

হয়েন, স্থিরদৃষ্টিতে এক একবার দেখেন যেন অন্ধকারের মধ্যে কি দেখিতে পাইলেন, আবার পদসঞ্চারণ করিতে থাকেন; একবার মুখে ঈষৎ হাস্য লক্ষিত হয়, আবার বদনমণ্ডল কঠোরভাব ধারণ করে, ললাট কুঞ্চিত হয়।

একবার স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া একদিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অর্দ্ধ-স্ফুটবচনে বলিতে লাগিলেন—

"উজ্জ্বল মণিময় মুকুট, ময়ূর সিংহাসন, প্রশস্ত ভারতপ্রদেশ, পিতার দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্খলিত হইতেছে, কে লইবে?—দারা সাবধান! তোমার সাহস আছে, বল আছে, কিন্তু আমিও দুর্ব্বলহস্তে অসি ধারণ করি নাই; পথ ছাড়িয়া দাও, নচেৎ অসিহস্তে পথ পরিষ্কার করিব। তুমি আত্মা-ভিমানী, দর্পী, কিন্তু তোমা অপেক্ষা ভীষণ দর্প ও দৃঢ়তর ব্রত সহাস্য বদনের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। মোরাদ! তুমি সাহসী বীর! সিংহাসনে বসিবে? তবে শূকর যেরূপ কর্দ্দমে পড়ে সেইরূপ ধরাতলে লুটাইয়া পড়িলে কেন? অচেতন? কল্য যুদ্ধ হইবে, অদ্য বিলাসবিহ্বল? সাহস? বন্য শূকরেরও ভীষণ সাহস আছে! যতদিন আবশ্যক তোমার দ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধি করিব, তাহার পর এইরূপ পদাঘাত করিয়া তোমাকে দূরে ফেলিয়া দিব। কল্য যুদ্ধ হইবে, ললাটের লিখন কি আছে! পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভ্রাতার শোণিতে দেশ প্লাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ভীষণ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই। হৃদয়! সাহসে নির্ভর কর, আরও অগ্রসর হইব; অসিহস্তে কণ্টকময় পথ পরিষ্কার করিব; আবশ্যক হয় উজ্জয়িনী হইতে আগ্রাপর্য্যন্ত পথ নররক্তে রঞ্জিত করিব, কিন্তু এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইবে না। পিতামহ তৈমুর! তোমার মুকুটে এই ললাট শোভিত করিব, নচেৎ সিপ্রাবারি কল্যই হৃদয়শোণিতে রঞ্জিত করিব।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনীর যুদ্ধ

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বৈশাখ মাসে ভীষণ যুদ্ধ হইল। মোরাদ ও আরং-জীবের সৈন্যেরা সিপ্রা পার হইবার উদ্যম করিতে লাগিল, কিন্তু সে বড়

সহজ ব্যাপার নহে। আরংজীব সৈন্যের পার হইবার জন্য অতিশয় নিপুণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উন্নত স্থানে তাঁহার কামান সাজাইয়া শত্রুর সম্মুখে আগমন রোধ করিয়া নিজ সৈন্যকে নদী পার হইতে বলিলেন। শত্রুরাও কামান সাজাইয়াছিল ও তদ্দ্বারা আরংজীবের সৈন্যের নদী পার হওয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; অনেকক্ষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ও যশোবন্তসিংহ অপূর্ব্ব বীর্য্যবল প্রকাশ করিয়া মোগলদিগের গতিরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সহযোদ্ধা কাসেম খাঁ সেরূপ যত্ন করেন নাই, তাৎকালিক লেখকেরা সন্দেহ করেন, যে তিনি আরংজীবের অর্থে বশীভূত হইয়া আপন গোলা বারুদ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সৈন্যের কামান অচিরাৎ নিস্তব্ধ হইল। এ অবস্থায় শত্রুর কামানের সম্মুখে যুদ্ধ করা যশোবন্তের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল, কিন্তু তিনি ভগ্নপ্রযত্ন না হইয়া অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে লাগিলেন। সেস্থান পর্ব্বতময় সুতরাং আক্রমণকারীগণ সহজে নদী পার হইতে পারিল না; কিন্তু সাহসী মোরাদ কতিপয় সৈন্য লইয়া সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া খড়্গহস্তে জয় জয়নাদে নদী পার হইলেন, তাহা দেখিয়া সমস্ত সৈন্য নদী পার হইল। ভীরু কাসেম খাঁ তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে পলায়ন করিলেন, সুতরাং যশোবন্তসিংহের বিপদের সীমা রহিল না। কিন্তু সেই অসমসাহসী রাজপুত চতুর্দ্দিকে শত্রুকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া ও জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তখনও তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনাসংখ্যা ক্ষীণ হইয়া যাইল, তাঁহার প্রিয় ভৃত্যেরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে হত হইতে লাগিল, মোগলেরা জয় জয়নাদে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিতে লাগিল, তথাপি বীর রাজপুতেরা রণে ভঙ্গ দিল না। ধন্য বীরত্ব! অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর আর যুদ্ধ করা বৃথা বিবেচনা করিয়া অবশেষে যশোবন্তসিংহ কেবলমাত্র পঞ্চশত সেনা লইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন, সপ্ত সহস্রেরও অধিকসংখ্যক্ রাজপুত সেই দিন সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদান করে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চিতোর।

যশোবন্তসিংহের অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক্ সেনা রাজপুতানা অভিমুখে আসিতে লাগিল। নরেন্দ্র তাঁহার পরম বন্ধু, গজপতির মরণে অতিশয় দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রত্যহ নূতন নূতন দেশ দেখিতে দেখিতে সে দুঃখ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইলেন। কয়েক দিন আসিতে আসিতে সৈন্যেরা অবশেষে রাজপুতানার অভ্যন্তরে আসিয়া পড়িল। যশোবন্ত-সিংহ মাড়ওয়ার দেশেব রাজা, সে দেশে আসিতে হইলে মেওয়ার দেশের অভ্যন্তব দিয়া আসিতে হয়।

মেওয়ার দেশের পর্ব্বতরাশি ও অসংখ্য দুর্গ দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। দুর্গগুলি প্রায়ই পর্ব্বতচূড়ায় প্রস্তররাশির দ্বারা বিনির্ম্মিত, সে দুর্গ সহসা হস্তগত কবা শত্রুর দুঃসাধ্য। পর্ব্বত যেন গগন স্পর্শ করিবার জন্য উত্থিত হইয়াছে ও উন্নতশিরে মুকুটস্বরূপ দুর্গ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সে সমস্ত দুর্গে উঠিবার পথ নাই, কেবল একদিকে সোপানের ন্যায় আছে, তাহার উপর দিয়া লোকে গমনাগমন করে; যুদ্ধকালে দুর্গের ভিতর খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত হয়, সেই একটীমাত্র দ্বার রুদ্ধ হয়; পরে শত্রুগণ যাহাই করুক না, দুর্গবাসীগণ নিশ্চিন্তে থাকিতে পারে। শত্রুরা দুর্গে উঠিবার উপক্রম করিলে উপর হইতে প্রস্তররাশি নিক্ষিপ্ত হয়, একেবারে বহুসংখ্যক্ শত্রু বিনষ্ট হয়।

এইরূপ দুর্গ ও পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে সৈন্যেরা অবশেষে সন্ধ্যার সময় চিতোরের দুর্গের নিকট আসিয়া পড়িল। সৈন্যেরা আহারাদি সমাপ্ত করিয়া আপন আপন শিবিরে বিশ্রাম করিতে গেল, কিন্তু নরেন্দ্র কতিপয় রাজপুতের সহিত সেই ভগ্নদুর্গ দেখিতে যাইলেন। চারিদিকে যত দেখিতে লাগিলেন, ততই চিতোরের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ হইতে লাগিল, ততই বিস্মিত হইলেন। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া এক শিলাতলে উপবেশন করিলেন।

সহসা তাঁহাদের সম্মুখে একজন বৃদ্ধ মনুষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুতদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তিন চিতো-রের পুরাতন "চরণ"। "চরণ" অর্থ কবি। তাঁহারা রাজপুতানার পূর্ব্ব রাজাদিগের গৌরবগীত গাইয়া রাজপুরুষ ও নগরবাসীদিগের মনোরঞ্জন

করেন। রাজপুতানায় এক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধ্যার সময় লোকে সমবেত হইয়া চরণের গীত শুনিতে ভালবাসে ও পূর্ব্বগৌরব-গান শুনিতে শুনিতে তাহাদের হৃদয় স্ফীত হয় ও নয়ন বীরাশ্রুতে আপ্লুত হয়।

সে স্থানটী অতিশয় ভীষণ, পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে আরাবলী পর্ব্বত-শ্রেণী নীলবর্ণ মস্তক আকাশে উন্নত করিয়া রহিয়াছে। নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য পর্ব্বত, বৃক্ষ ও জঙ্গলে আবৃত, তাহা হইতে শত শত ঝরণা অবতরণ করিতেছে। আকাশের ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে পর্ব্বতের নীলিমাকে গাঢ়তর করিতেছে ও রজনীর অন্ধকার গভীরতর করিতেছে, সেই অন্ধকারে পর্ব্বতনদের ভীষণ অবতরণ-শব্দ ও মেঘের ভীষণতর গম্ভীর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রুত হইতেছে না; ও সম্মুখস্থ চিতোরের পর্ব্বতদুর্গ ও পশ্চাতে নীল পর্ব্বতশ্রেণী ভিন্ন আর কিছু লক্ষিত হইতেছে না। রাজপুত-গণ চরণকে শিলার উপর বসাইলেন ও আপনারা চারিদিকে বসিয়া প্রতাপসিংহের গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, চরণ সেই গান আরম্ভ করিল। নদী ও অম্বর অপেক্ষা ভীষণতর গর্জ্জনে মেওয়ারের বৃদ্ধ কবি চিতোরের গৌরব বর্ণন করিতে লাগিল। চরণ সূর্য্যবংশের যশোরাশির ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, কেন না মেওয়ারাধিপতি সূর্য্যবংশাবতংস। ক্রমে আরও তীব্রস্বরে গাইলেন, "রাজপুতগণ! একটী গীত শুন, এটী আমার গীত নহে, ঐ অম্বরগর্জ্জন-প্রতিঘাতী পর্ব্বত-শৃঙ্গের গীত, ঐ বজ্রনাদী জলপ্রপাতের গীত, তোমরা শ্রবণ কর। যে পর্ব্বত-কন্দরে এক-জন রাজপুত সেনার অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে, সেই গহ্বর হইতে এই গীত বহির্গত হইতেছে, যে পর্ব্বততরঙ্গবাহিনীর জল একবিন্দু রাজপুতের শোণিতেও আরক্ত হইয়াছে, সেই তটিনীর কূলে এই গীত ধ্বনিত হই-তেছে। প্রতাপসিংহ! জগতে তোমার ন্যায় বীর আছে? তুমি মনুষ্য না দেবতা? ঐ দেখ আকবরের ভীষণপ্রতাপে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছে, কিন্তু প্রতাপের হৃদয় কম্পিত হইল না। চিতোর নগর আর তাঁহার নাই, তাঁহার পিতার রাজত্বকালে নিষ্ঠুর আকবর কাড়িয়া লইয়াছে, দুর্গরক্ষার্থ জয়মল্ল ও পত্ত অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া জীবন দিয়াছিল, পত্তের মাতা ও বনিতা স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়া জীবনদান করিয়া-ছিল, তথাপি রাজপুতের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া চিতোর-রত্ন আকবর কাড়িয়া লইলেন, ৭৪॥ মণ মণিমাণিক্য কাড়িয়া লইলেন, সেই অবধি ৭৪॥ অঙ্ক নিষেধের শপথ হইয়াছে। প্রতাপ যখন রাজা হইলেন তখন চিতোর নাই, সৈন্য নাই, অর্থ নাই, কিন্তু তাঁহার বীরান্তঃকরণ ছিল, বীরের

দুঃসাধ্য কি আছে? প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজপুত রাজগণ দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিলেন, প্রতাপ করিলেন না। অম্বরের * ভগবানদাস, মাড়-ওয়ারের মল্লদেব নিজ নিজ দুহিতাকে দিল্লীর সম্রাটহস্তে অর্পণ করিলেন, মহানুভব প্রতাপ ম্লেচ্ছের কুটুম্ব হইতে অস্বীকার করিলেন। কেন স্বীকার করিবেন? মেওয়ারাধিপতিরা সূর্য্যবংশাবতংস, সে উন্নত বংশ কেন কলুষিত করিবেন?

"সাগরতরঙ্গের ন্যায় দিল্লীর সেনা মেওয়ার প্লাবিত করিল; তাহার সঙ্গে—হা জগদীশ! এ লজ্জার অঙ্ক কেন রাজস্থানের ললাটে অঙ্কিত করিলে? তাহার সঙ্গে রাজপুত রাজগণ যোগ দিলেন। মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি নানাদেশের রাজারা আপনাদিগের দাসত্বের কলঙ্ক অপনীত করিবার জন্য, প্রতাপকেও দিল্লীর দাস করিবার জন্য, আকবরের সহিত যোগ দিলেন। অম্বরের মানসিংহ প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; মহানুভব প্রতাপ ম্লেচ্ছের কুটুম্বের সহিত ভোজনে অস্বীকার হইলেন। সরোষে মানসিংহ দিল্লী যাইয়া অসংখ্য সেনাতরঙ্গে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিলেন। মানসিংহ! বড় কীর্ত্তির কার্য্য করিলে, ম্লেচ্ছের দাস হইয়া স্বদেশের ধ্বংশচেষ্টায় আসিলে? মানসিংহ! তুমি কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া শত্রুদমন করিয়াছিলে; কাহার জন্য? হায়! ম্লেচ্ছের অধীন হইয়া রাজপুত নাম ডুবাইলে? ম্লেচ্ছের পদরজঃ রাজ-পুতের ললাটে কি সুন্দর শোভন হইয়াছে!

"অন্ধকারে ঐ ভীষণ জলপ্রপাতের ভীষণ তেজ দেখিতে পাইতেছ? সরোষ গর্জ্জন দূর হইতে শুনিতে পাইতেছ? না, তোমরা পাইবে না, কিন্তু আমি অন্ধকারে থাকি, আমি দেখিতেছি। উহার মধ্যস্থলে উন্নত শিলাখণ্ড সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ভীষণ জলপ্রপাতেও কম্পিত হই-তেছে না। জলপ্রপাত অপেক্ষা ভীষণতর তেজে সাগরগর্জ্জনে মোগল-সৈন্য আসিয়া মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিল; শিলাখণ্ডের ন্যায় সগর্ব্বে প্রতাপ দণ্ডায়মান রহিলেন। যে দিন হলদীঘাটের মহাযুদ্ধ হইল, সেনাদিগের ভীষণ রব পর্ব্বতকন্দর হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তিনবার প্রভু শত্রুদিগের মধ্যে যাইয়া পড়িলেন, তিনবার তাঁহার প্রিয় অনুচরগণ

* আধুনিক জয়পুর।

তাঁহাকে অনেক কষ্টে বাহির করিয়া আনিল। ভগবন্! এ কি পুনরায় আর্জ্জুনী জগতে ফিরিয়া আসিল? হায়! সাহসে কি হইবে? মোগলের যে অসংখ্য সেনা! দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুতের মধ্যে কেবল অষ্ট সহস্র লইয়া প্রতাপ পলায়ন করিলেন, অবশিষ্ট হলদীঘাটের ভীষণ উপত্যকায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিলেন*।

"এই কি একবার? বৎসর বৎসর এইরূপ সংগ্রাম হইল, বৎসর বৎসর প্রভুর সেনা, ধন, রাজ্য হ্রাস পাইতে লাগিল, বৎসর বৎসর তাঁহার জীবনাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব হ্রাস হইল না, তিনি দিল্লীর দাস হইলেন না।

"রাজপুত! তোমাদের চক্ষুতে যদি জল থাকে, বিসর্জ্জন কর, হৃদয়ে যদি শোণিত থাকে, বিসর্জ্জন কর! ঐ দেখ প্রতাপের রাজরাণী পর্ব্বত-কন্দরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছে, রাজরাণী পর্ব্বতকন্দরে শয়ন করিয়া আছেন, প্রতাপ খড়্গাহস্তে জাগরিত হইয়া আছেন। ঐ দেখ বৃক্ষ হইতে রজ্জু লম্বিত হইয়াছে, কাষ্ঠাসনে কি দুলিতেছে? জগদীশ! এই কি বীরত্বের পুরস্কার? রাজার শিশু পুত্রেরা ঝুলিতেছে, নীচে রাখিলে হিংস্রক জন্তু লইয়া যাইবে। আর ঐ দেখ রাজমহিষী ও তাঁহার পুত্রবধূ শুষ্কপত্র জ্বালাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতেছেন। রুটী প্রস্তুত হইল, সকল খাইও না, অর্দ্ধেকটী খাও, অর্দ্ধেক রাখিয়া দাও, আবার ক্ষুধা পাইলে কোথায় পাইবে? উঃ! ও কি হৃদয়-বিদারক ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল! একটী বালিকার হস্ত হইতে বন্যবিড়াল রুটী কাড়িয়া লইয়া যাইল, বালিকা ক্ষুধায় চীৎকার করিয়া উঠিল†। ভগবন্, তোমার কি পাষাণ হৃদয়! এ বিষম দুঃখে দুঃখিত হইলে না, এ বিষম ক্রন্দনে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না!" উন্মত্ত চরণের হস্ত হইতে বীণা পড়িয়া যাইল, বায়ুতে তাহার শুক্ল কেশ উড়িতে লাগিল, নয়ন হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কবি বলিতে লাগিল—"রাজপুতগণ, প্রতাপের জয়গীত গাও, পঞ্চবিংশ বৎসর মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্ব্বতশিখরে বাস করিয়াছেন, পর্ব্বত-উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্ব্বতকন্দরে স্ত্রীপরিবারকে পালন

---

* ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ।

† প্রকৃত ঘটনা।

করিয়াছেন, তথাপি ইহজন্মে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। গাও, রাজপুতগণ এই গীত গাও; পর্ব্বতে পর্ব্বতে এই গীত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক; সমগ্র রাজস্থানে এই গীত শব্দিত হইতে থাকুক; হিমালয় হইতে প্রতিহত হইয়া সাগরবারি পর্য্যন্ত সঞ্চরণ করুক; হিমালয় অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হউক; আর যদি স্বর্গে সাহস ও স্বদেশানুরাগের গৌরব থাকে, সে গীত আকাশপথে উত্থিত হইয়া স্বর্গের দ্বারে সজোরে আঘাত করিয়া মানবের যশঃ-কীর্ত্তি বিস্তার করুক!"

চরণের ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল; আবার সকলে চাহিয়া দেখিল চরণ নাই, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, কেবল আকাশে অম্বর ভীষণ গর্জ্জন করিয়া যেন তাহার ভয়াবহ গীত বার বার ধ্বনিত করিতে লাগিল!

রাজপুতেরা স্বদেশের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিতে করিতে উৎসাহে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, কোন কোন বীরপুরুষের চক্ষু বীরাশ্রুতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, সকলেই উঠিয়া আপন আপন শিবিরে প্রস্থান করিল। নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না, তিনি হুঙ্কারশব্দ করিলেন না; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া সেই ভীষণ মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে ভীষণ চিতোরদুর্গের তলে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। মেঘ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, অচিরাৎ বৃষ্টি হইবে, নরেন্দ্র ঘরে যাও।—নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না। আকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বল বিদ্যুল্লতা জগৎ ও গগনমার্গ চমকিয়া চলিয়া যাইল; রহিয়া রহিয়া মেঘ ভীষণ গর্জ্জনে পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিল; রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু ভীষণ উচ্ছ্বাসে চলিয়া যাইতে লাগিল;—নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না।

নরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন—"স্বদেশেও মহাবলপরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তাঁহারা কি করিতেছেন, সুন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দ্দশা কেন? আজি ছয় শত বৎসর অবধি পরাক্রান্ত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজপুতেরা স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, বঙ্গদেশে মুসলমান পদার্পণ না করিতে করিতে হিন্দুরাজ্যের নাম লুপ্ত হইল। যুদ্ধই রাজপুতদিগের ব্যবসা; বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোকেরাও সময়ে সময়ে যুদ্ধ করে, তাহারা ধন দিয়াছে, ঐশ্বর্য্য দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেয় নাই; তাহাদের গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে, নগর লুণ্ঠিত হইয়াছে, দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা গৌরব বিসর্জ্জন দেয় নাই; সে গৌরব-গীত আজিও আরাবলীর কন্দরে, উপত্যকায় গীত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে!

আর বঙ্গদেশ! বেগপ্রবাহিনী গঙ্গানদী গৌরবগীত গায় না, ব্রহ্মপুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না; রাজা প্রজা সকলেই অধীনতা নিদ্রায় সুপ্ত, বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছে! জগতে তাহাদিগের নাম নাই, অথবা তাহাদিগের নাম কেবল ঘৃণার পদার্থ। হা বিধাত!" বলিয়া নরেন্দ্র ললাটে সজোরে করাঘাত করিলেন, ললাট হইতে রুধির-ধারা বহিতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যোধপুর।

পরদিন প্রাতে নরেন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, উক্ত চরণ বাল্যকালে মেওয়ারাধিপতি প্রতাপসিংহের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রতাপ স্বপুত্র অমরুকে যেরূপ ভাল বাসিতেন, চরণকেও সেইরূপ ভাল বাসিতেন, অনেক সময়ে অমরুকে বলিতেন, "অমক, তোর অপেক্ষা চরণ যোদ্ধা হইবে।" বাল্যকালাবধি চরণের ভীষণ তেজ ও অভিমান লক্ষিত হইত, প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতগুহা ও উপত্যকায় বাস করিত ও সেই অল্পকালেই রাজার কীর্ত্তিগান রচনা করিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

আকবরসাহের সেনার সহিত অসংখ্য সংগ্রামের পর প্রতাপের যখন কাল হইল, তখন চরণের বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর, সে আজ ৬০ বৎসরের কথা, সুতরাং চরণের বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ৯০ বৎসর, তথাপি অমানুষিক বলে পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ দিয়া রজনীতে বিচরণ করে; সকলেই বলে চরণ দৈববলে বলিষ্ঠ।

প্রতাপের মৃত্যুর সময় তিনি মৃত্যু-শয্যার নিকট অমরুকে আনিয়া শপথ করাইয়াছিলেন যে, তিনিও পিতার ন্যায় চিরকাল মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, অধীনতা স্বীকার করিবেন না। পিত্রাজ্ঞা পালনের জন্য অমরু অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আকবর ও তাঁহার পুত্র জেহাঙ্গীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও পিতার ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে চরণ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও সর্ব্বসময়ে পিতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উত্তেজনা করিতেন। কিন্তু সে উত্তেজনা বিফল; আর না পারিয়া অমরু জেহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু

সে নামমাত্র অধীনতা। অমরু স্বদেশের রাজা রহিলেন, দিল্লীতে যে কর প্রাঠাইতেন তাহা দ্বিগুণ করিয়া মহানুভব জেহাঙ্গীর তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতেন; অমরুকে দিল্লী যাইতে হইত না, তাঁহার পুত্র কর্ণ ও পৌত্র জগৎসিংহকে জেহাঙ্গীর ও তাঁহার মহিষী নুরজেহান সর্ব্বদাই সমাদরের সহিত আহ্বান করিতেন ও অনেক মণিমুক্তা দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। ইহাকে প্রকৃত অধীনতা বলে না, তথাপি চরণ রোষে অভিমানে অমরুকে রাজা জ্ঞান না করিয়া অনেক কটূক্তি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আকবরকর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংস হওনের পরই উদয়পুর নামে এক সুন্দর রাজধানী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু চরণ তথায় যাইতে অস্বীকার করিলেন, তিনি সরোষে ভগ্ন চিতোরদুর্গে বাস করিতে লাগিলেন, একদিন দুইদিন অন্তর দুর্গ হইতে অবতরণ করিতেন, নীচে পল্লীগ্রামবাসীরা যাহা দিত তাহাই খাইতেন, আবার দুর্গে আরোহণ করিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এইরূপ থাকিতে থাকিতে চরণ উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন, পর্ব্বতশৃঙ্গ তাঁহার বাসস্থান হইয়াছে, মেঘগর্জ্জন ও ঝটিকায় বন কম্পিত হইলে তাঁহার বড় উল্লাস হয়, তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন আবার প্রতাপ আকবরসাহের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

রাজপুত সেনাগণ কয়েকদিন ভ্রমণ করিতে করিতে আরাবলী পার হইয়া যাইল। জগতের মধ্যে পর্ব্বতের যেরূপ উন্নত শোভা ও মাহাত্ম্য, সেরূপ শোভা বোধ হয় অন্য কোন বস্তুরই নাই। যাঁহারা পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারাই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। সেনাগণ কখন উপত্যকার নীচে দিয়া যাইতেছে, দুই দিকে ভীষণ পর্ব্বত-রাশি মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, শেখরগুলি যেন আকাশ হইতে নীচে অবলোকন করিতেছে, সেই সমস্ত শেখর হইতে অসংখ্য জলপ্রপাত দূর হইতে রৌপ্যপুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কখন রবিকরে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, কখন বা অন্ধকারে দৃষ্ট হইতেছেনা। ঝরণার জল নিম্নে পড়িয়া কোন স্থানে বেগবতী নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে, আবার কোথাও বা চারিদিকে পর্ব্বত থাকায় সুন্দর স্বচ্ছ পর্ব্বতহ্রদ সৃষ্ট হইয়াছে, সে হ্রদ কি সুশোভন, কি মনোহর! জল পরিষ্কার, নিষ্কম্প, তাহার উপর চারি-দিকের পর্ব্বতশেখরের ছায়া যেন নিদ্রিত রহিয়াছে। শব্দমাত্র নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া বায়ু পর্ব্বতবৃক্ষের ভিতর দিয়া মরমর্ শব্দে সঞ্চরণ করিতেছে; কেবল গিরিপ্রবাহিণী ঝরণাগুলি শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ দিতে দিতে অবতরণ করিতেছে, ও অবারিত সুললিতস্বরে হ্রদের বক্ষে জলরাশি ঢালিয়া দিতেছে; স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও শৈলদ্বারা শতধা বিভিন্ন

জলরাশি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে, যেন প্রজা মণিমাণিক্য মুক্তাফল ঢালিয়া দিয়া রাজার পূজা করিতেছে, অথবা পতিব্রতা কামিনী মুক্তাফল অপেক্ষা অমূল্য অজস্র প্রেমরাশি ঢালিয়া দিয়া পতির চরণসেবা করিতেছে।

কখন বা সেনাগণ নিশাকালে পর্ব্বতশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে লাগিল। সে যে অপরূপ শোভা, কাহার সাধ্য বর্ণনা করে। শেখর চন্দ্রকরে সমুজ্জ্বল, কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে নিস্তব্ধ, গম্ভীর, শান্ত, যেন যোগী-পুরুষ পার্থিব সকল প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরিষ্কার আকাশে ললাট উন্নত করিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। সেই গম্ভীর রজনীতে পর্ব্বতের সেই গম্ভীর শোভা দেখিলে যথার্থই মানবের অকিঞ্চিৎকারিত্ব দেদীপ্যমান হয়, মানবীয় দর্প, অভিমান, আশা, রোষ মুহূর্ত্তের জন্যও তিরোহিত হয়। যজ্ঞোপবীতস্বরূপ যোগীপুরুষের স্কন্ধ হইতে ঝরণা লম্বিত রহিয়াছে, চন্দ্রকরে কি অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে।

পর্ব্বতের সহস্র উপত্যকা ও কন্দরে অসভ্য আদিমবাসীরা বাস করিতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও যেরূপ, রাজপুতানায়ও সেইরূপ আর্য্যবংশীয়েরা অসিহস্তে আসিয়া কৃষিকার্য্যোপযোগী সমস্ত দেশ কাড়িয়া লইয়াছে, আদিমবাসীরা, পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেছে। তাহারা রাজপুতানার রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করে না; তথাপি মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের সময় অনেক সময় ধনুর্ব্বাণহস্তে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া রাজপুতদিগের অনেক সহায়তা করিয়াছে।

পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যশোবন্ত অচিরাৎ আপন মাড়ওয়ার দেশে আসিয়া পড়িলেন। মেওয়ার ও মাড়ওয়ার দুই দেশ দেখিলেই বোধ হয় যেন প্রকৃতি স্বহস্তেই দুই দেশের বিভিন্নতা সাধন করিয়াছেন। মেওয়ারে যেরূপ পর্ব্বতরাশি ও বিশাল বৃক্ষাদি ও লতাপত্রের গৌরব, মাড়ওয়ারে তাহার বিপরীত; পর্ব্বত নাই, অশ্বত্থ, বট, প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ নাই, উর্ব্বরা ক্ষেত্র নাই, বেগবান তরঙ্গ নাই, পর্ব্বত-বেষ্টিত হ্রদ নাই, কেবল মরুভূমিতে বালুকারাশি ধূধূ করিতেছে, ও স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্রকায় কণ্টকময় বাবুল ও অন্যান্য বৃক্ষ দেখা যাইতেছে। এই মরু-ভূমির উপর দিয়া সেনাগণ যাইবার সময় মেওয়ারদেশীয় একজন চরণ মাড়ওয়ারী এক সেনাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—

আক রা ঝোপ, ফোক রা বার,
বাজরা রা রোটী, মোঠ রা দার,
দেখো হো রাজা তেরি মাড়ওয়ার।

সেনা হাস্য করিয়া সগর্ব্বে উত্তর করিল, "আমাদের জন্মভূমি উর্ব্বরা নহে, কিন্তু বীর-প্রসবিনী।" প্রকৃত মাড়ওয়ারের রাজপুতেরা কঠোর জাতি, রাজপুতানায় তাহাদের অপেক্ষা সাহসী জাতি আর ছিল না।

সৈন্যগণ এইরূপে কয়েকদিন ভ্রমণ করিতে করিতে রাজধানী যোধপুরের সম্মুখে পৌঁছিল ও শিবির সন্নিবেশিত করিল।

তখন নরেন্দ্র স্বীয় বন্ধু গজপতির কথা স্মরণ করিয়া একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। রাজা যশোবন্তসিংহ শিবিরে একাকী বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছেন; নরেন্দ্র তাঁহার নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন। "মহারাজের জয় হউক!" রাজা ফিরিয়া দেখিলেন একজন অল্পবয়স্ক সেনা। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি আবশ্যক?"

নরে। "মহারাজ! সিপ্রাতীরে আপনার একজন অনুচর হত হইয়াছেন, পূর্ব্বে একবার তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এক মুক্তামালা মহারাজ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি আপনার দানের অপমান করেন নাই, সম্মুখযুদ্ধে হত হইয়াছেন, এ মুক্তামালা আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে বলিয়াছেন।"

রাজা সেই মুক্তামালা ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হা! গজপতি, মাড়ওয়ারের কুলতিলক, তোমা অপেক্ষা সাহসী আমার শিবিরে কেহ ছিল না। একবার যুদ্ধে আমার জীবনরক্ষা করিয়াছিলে, সেই জন্য তোমাকে মুক্তামালা দিয়াছিলাম, এবার আপনার জীবন আমার জন্য বিসর্জ্জন দিয়া সেই মালা ফিরাইয়া দিলে!—বৎস, নদীর জল একবার যাইলে আর ফিরিয়া আইসে না, রাজা একবার দান করিলে আর ফিরাইয়া লন না, তোমার বন্ধুর মুক্তামালা তুমি ললাটে ধারণ করিও, ও যুদ্ধের সময় তাহার বীরত্ব যেন তোমার স্মরণ থাকে।"

নরেন্দ্র রাজাকে শত ধন্যবাদ দিয়া সেই মালা শিরে ধারণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমার আর একটী আবেদন আছে। গজপতির দুইটী শিশুসন্তান আছে, তাহাদের মাতা নাই। গজপতি মহারাজকে বলিয়াছেন, যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, যেন কালে শিশু রঘুনাথও রাজাজ্ঞায় পিতার ন্যায় সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকামনা তাহার পিতাও জানে না।"

এই করুণবাক্য শুনিয়া রাজার নয়নে জল আসিল; তিনি বলিলেন, "বৎস, ক্ষান্ত হও, আমি সেই শিশুদের পিতাস্বরূপ হইব, যোধপুরের

রাজ্ঞী স্বয়ং তাহাদের মাতা হইবেন। এখনও তাঁহাকে আমাদের আগমন-সংবাদ দেওয়া হয় নাই; আমাদের দূত যাইতেছে, যাও, তুমি স্বয়ং দূতের সঙ্গে যাইয়া রাজ্ঞীর নিকট গজপতির আবেদন জানাও এবং তাহার শিশু-দের জন্য দুটী কথা বলিও।

রাজার আজ্ঞানুসারে নরেন্দ্র কয়েকজন রাজপুত দূতের সহিত যোধ-পুরের দুর্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে কেবল বালুকারাশি-পরিবেষ্টিত, দীর্ঘে দ্বাদশ ক্রোশ, প্রস্থে এক ক্রোশ, ও অনতি-উচ্চ একটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে; সেই পর্ব্বতের একটী শেখরের উপর যোধপুর নগর নির্ম্মিত। শেখরস্থ উচ্চ রাজবাটী ও ভীষণ দুর্গ নিম্নে চতুর্দ্দিকস্থ মরুভূমির উপর যেন কোপদৃষ্টি করিতেছে। নরেন্দ্র সেই পর্ব্বতে দুইটী হ্রদ দেখিলেন; পূর্ব্বদিকে "রাণীতলাও" ও দক্ষিণ দিকে "গোলাপ সাগর।" নরেন্দ্র আরও দেখিলেন, শেষোক্ত হ্রদ হইতে নগরবাসিনী শত শত কামিনী জল লইতে আসিয়াছে, হ্রদের পার্শ্বস্থ সুন্দর উদ্যানে শত শত দাড়িম্ববৃক্ষ ফল ধারণ করিয়াছে ও নাগরিকগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে সেই উদ্যানে বিচরণ করিতেছে। ঊর্দ্ধে প্রকাণ্ড দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ;—স্বভাবতই দুর্গম পর্ব্বত শত স্তম্ভ ও প্রাচীরদ্বারা রক্ষিত হইয়া শত্রুর পক্ষে অধিকতর দুর্গম হইয়াছে। রাজ্ঞীর আদেশে দূতগণ ও নরেন্দ্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত হর্ম্ম্যে মহারাজ্ঞী রাজসিংহাসনে বসিয়া আছেন, চারিদিকে সহচরী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ও চামর ঢুলাইতেছে; তাঁহার তেজোব্যঞ্জক বদনমণ্ডল অবগুণ্ঠনে কিঞ্চিৎ আবৃত হইয়াছে, তথাপি সে রূপরাশি ও নয়নের অগ্নিবৎ উজ্জ্বলতা সম্যক্ লুক্কায়িত হয় নাই। গরীয়সী বামা যথার্থই রাজমহিষীর ন্যায় সিংহাসনে বসিয়া আছেন, নিবিড়কৃষ্ণকেশে উজ্জ্বল রত্নরাজি ধক্‌ধক্ করিতেছে।

দূত প্রণত হইয়া ধীরে ধীরে সভয়ে সকল সংবাদ জানাইলেন। মহা-রাজ্ঞী ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন, বজ্রপাত ও ঝটিকার পূর্ব্বে আকাশমণ্ডল সেইরূপ নিস্পন্দ থাকে। সহসা অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া আরক্তনয়নে দূতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—

"কাপুরুষ! ভগ্নদূত! সেই সিপ্রানদীতে আপনার অকিঞ্চিৎকর শোণিত বিসর্জ্জন করিতে পার নাই? আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, আর তোমার প্রভু সেই কাপুরুষকে বলিও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কলঙ্করাশিতে কলঙ্কিত হইয়াছেন, তিনি আমার এ পবিত্র দুর্গে প্রবেশ পাইবেন না।" পরে সিংহীর ন্যায় ভীষণস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

তিনি ক্ষত্রিয় নহেন, তিনি আমার স্বামী নহেন, এ নয়ন যশোবন্ত-সিংহকে আর দেখিবে না। আমি মেওয়ারের রাণার দুহিতা, প্রতাপ-সিংহের কুলে যে বিবাহ করিবে সে ভীরু কাপুরুষ কেন হইবে? যুদ্ধে জয় করিতে পারিলেন না, কেন সম্মুখ রণে হত হইলেন না?—

"কাপুরুষ! এক্ষণও দণ্ডায়মান আছ,—আমার যোদ্ধাগণ কোথায়? দূতগণকে পর্ব্বতের উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ কর, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর।"—রাজ্ঞীর সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, ক্রোধে কণ্ঠরুদ্ধ হইল, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন নরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে অতিশয় গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—

"মহারাজ্ঞি! আমাদের সম্বন্ধে যে আদেশ করিলেন তাহা শিরোধার্য্য, কিন্তু মহারাজ যশোবন্তসিংহকে কাপুরুষ বলিবেন না, এই নয়নে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, যতদিন জীবিত থাকিব এরূপ ভীষণ যুদ্ধ কখনও দেখিব না, এরূপ অদ্বিতীয় বীর কখনও দেখিব না।"

রাজ্ঞী ক্ষণেক স্থিরনয়নে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন, "যথার্থই কি আমার যশোবন্ত সম্মুখযুদ্ধ করিয়াছিলেন, তুমি বিদেশীয়, তোমার জীবনের কোন ভয় নাই, যথার্থ কথা বিস্তার করিয়া বল।"

নরেন্দ্র যুদ্ধের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। রাজপুতের যেরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন, মহারাজের যেরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। শেষে বলিলেন—"যখন মেঘরাশির ন্যায় চারিদিকে মোগল-সেনা আসিয়া বেষ্টন করিল, যখন ধূম ও ধূলায় ক্ষেত্র অন্ধকার হইয়া যাইল, যখন ভীরু কাসেম খাঁ পলায়ন করিল, তখনও মহারাজ অমানুষিক সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজপুতেরা সহস্র সহস্র হত হইয়া পর্ব্বত, উপত্যকা ও সিপ্রানদী আরক্ত করিয়াছে; রাজার চতুর্দ্দিকে অল্পসংখ্যকমাত্র রাজপুত আছে; আরংজীব ও মোরাদ সহস্র মোগলসৈন্য সমেত রাজার উপর আক্রমণ করিলেন; তখনও মহারাজ অমানুষিক সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজার পদতলে শত শত রাজপুত হত হইতে লাগিল; রাজপুতসংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল; মোগলের জয় জয়নাদে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু মহারাজের হৃদয় কম্পিত হইল না। অষ্ট সহস্র রাজপুতের মধ্যে অষ্টশতও জীবিত ছিল না, তথাপি মহারাজ ক্ষেত্র পরিত্যাগ

করিলেন না; ঘোর কল্লোলিনী সিপ্রানদী ও ভীষণাকার বিন্ধ্যপর্ব্বত রাজা যশোবন্তের ভীষণ বীরত্বের সাক্ষী আছে।”

শুনিতে শুনিতে রাজ্ঞীর নয়নদ্বয় জলে ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল। বলিলেন—“তবে যশোবন্ত সম্মুখযুদ্ধে রাজপুতের নাম রাখিয়াছেন—বিদেশীয় দূত! এ কথায় আমার হৃদয় শীতল হইল। বল তাহার পর কি হইল।”

নরে। “মনুষ্যের যাহা সাধ্য, দেবতার যাহা সাধ্য, যশোবন্ত তাহা করিয়াছেন। যখন কেবলমাত্র পঞ্চশত সৈন্য জীবিত আছে দেখিলেন, অগত্যা পলায়ন করিলেন।”

“পলায়ন করিলেন! হা বিধাতঃ! রাজপুত পলায়ন করিলেন! রাণার জামাতা পলায়ন করিলেন!”—বক্ষঃস্থলে সজোরে করাঘাত করিয়া রাজ্ঞী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ দাসীগণ রাজ্ঞীর মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল, রাজ্ঞীও অল্পক্ষণ মধ্যেই চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া এবার করুণস্বরে বলিলেন, “সহচরি! চিতা প্রস্তুত কর, আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইয়াছেন, তিনি স্বর্গধামে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমি তথায় যাই;—যশোবন্তের নামে যে আসিয়াছে সে প্রবঞ্চক; আর তুই দূত, তোর সঙ্গিগণ সহিত এইক্ষণেই মাড়ওয়ার দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হ, নচেৎ প্রাণে হত হইবি।”

নরেন্দ্র ও দূতগণ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, রাজ্ঞীর আজ্ঞায় দুর্গের দ্বার রুদ্ধ হইল। বাহিরে যাইবার সময় যোধপুরের রাজমন্ত্রী দূতের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন—

“মহারাজের সহিত তোমাদের দেখা করিবার আর আবশ্যকতা নাই, এই পত্র লইয়া শীঘ্র মেওয়ার দেশের রাজধানী উয়য়পুরে যাও, তথায় রাণা রাজসিংহকে এই পত্র দিও, তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিবেন, আমাদের মহারাজ্ঞীর আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, মাড়ওয়ারে আর থাকিতে পাইবে না। মহারাজ্ঞীর মাতা তথায় আছেন; এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র তিনি যোধপুরে আসিবেন, তিনি ভিন্ন তাঁহার কন্যাকে কেহ শান্ত করিতে পারিবেন না।”

নরেন্দ্র দূতের সহিত অচিরাৎ মেওয়ার দেশের রাজধানী উদয়পুরে যাইলেন। তথাকার রাজাকে পত্র দিলেন ও তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

ইতিহাসে লিখিত আছে, যে যোধপুরের রাজ্ঞী ৮।৯ দিবস অবধি উন্মত্তপ্রায় হইয়া রহিলেন; পরে উদয়পুর হইতে তাঁহার মাতা আসিয়া তাঁহাকে অবশেষে সান্ত্বনা করিলেন। তখন তিনি যশোবন্তসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যশোবন্তসিংহ আরংজীবের সহিত অচিরাৎ যুদ্ধ করিতে যাইবেন স্থির হইল।

বিংশ পবিচ্ছেদ।

উদয়পুর।

মাড়ওয়ার দেশের প্রধান নগরী যোধপুর; মেওয়ার দেশে পূর্ব্বে চিতোর প্রধান নগরী ছিল, এক্ষণে উদয়পুর। মাড়ওয়ারের বালুকারাশি ও মরুভূমি হইতে পর্ব্বতপ্রধান মেওয়ার দেশে পুনরায় আসিতে নরেন্দ্রনাথ বড়ই আনন্দানুভব করিলেন; আবার আরাবলীর উচ্চ শেখর উল্লঙ্ঘন করিলেন; আবার পার্ব্বতীয় নদী ও প্রস্রবণেব বেগ ও মহিমা সন্দর্শন করিলেন; আবার শান্ত নিস্তব্ধ পর্ব্বত-হ্রদের শোভা দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে অতুল আনন্দ উদয় হইল। কিছুদিন এইরূপে ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ও যোধপুরের দূতগণ উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল সেরূপ সুন্দর স্থানে সেরূপ সুন্দর নগরী পূর্ব্বে তিনি কখন দেখেন নাই। নীচে সুন্দর শান্ত প্রশস্ত হ্রদ, নির্ম্মল আকাশ ও চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর ছায়া সযত্নে বক্ষে ধারণ করিতেছে; চতুর্দ্দিকে সুন্দর পর্ব্বতশেখরের পর পর্ব্বতশেখর, যতদূর দেখা যায়, চারিদিকে প্রকৃতি এই মনোহর উচ্চ প্রচীর দিয়া জগতে সুখের আবাসস্থানকে যেন রক্ষা করিতেছে; হ্রদের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতশ্রেণীর উপর সুন্দর রাজপ্রাসাদ ও শ্বেতবর্ণ সৌধমালা যেন সহাস্য বদনে নির্ম্মল দর্পণে আপনার সুন্দর প্রতিরূপ অবলোকন করিতেছে। নরেন্দ্রনাথের নয়নে ইহা অপেক্ষাও একটী বস্তু সুন্দর বোধ হইল, তাঁহার বোধ হইল যেন গৌরব, যশ, বীরত্ব সেই অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণীতে চিরকাল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, ও দেবতাস্বরূপ বীর্য্যবন্ত রাজপুতদিগকে চিরকাল রক্ষিত ও প্রোৎসাহিত করিতেছে।

সূর্য্যদ্বার দিয়া যোধপুরের দূত নগরে প্রবেশ করিলেন। যোধপুরে ও উদয়পুরে তখন বন্ধুত্ব ছিল, সুতরাং যোধপুরের দূতগণকে আহ্বান করিবার

জন্য নাগরিকগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রশস্ত পথ দিয়া নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণ রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতে লাগিলেন; চরণগণ "টপ্পা" অর্থাৎ মঙ্গলসূচক গীত গাইতে লাগিলেন; দুই পার্শ্বের স্ত্রীলোকগণ কলসকক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া "সুহেলিয়া" অর্থাৎ আনন্দগীত গাইয়া যোধপুরের দূতদিগকে আহ্বান করিলেন। দূতগণ সকলকেই দুই এক মুদ্রা পুরস্কার দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

অনন্তর রাজপ্রাসাদে পৌঁছিয়া রাণার অনুমতিক্রমে প্রাসাদের উপর উঠিলেন। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সোপান দ্বারা আরোহণ করিয়া সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিলেন। সেই মহলেই রাণা বিদেশীয় রাজা ও রাজদূতদিগকে আহ্বান করিতেন, বংশের আদিপুরুষ সূর্য্যের একটী প্রতিমূর্ত্তি সেই গৃহের এক দেওয়ালে খোদিত ছিল, সেই জন্য উক্ত মহলের নাম সূর্য্যমহল।

রক্তবর্ণ মকমলমণ্ডিত সূর্য্যরশ্মি-প্রতিঘাতী বহুমূল্য রত্নবিনির্ম্মিত রাজাসনে বাপ্পা রাওয়ের বংশাবতংস মহারাণা রাজসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন। চারিদিকে সুবর্ণখচিত রৌপ্য স্তম্ভের উপর একটী চন্দ্রাতপ মণিমুক্তায় ঝলমল করিতেছে। কিঞ্চিদ্দূরে পারিষদ্গণ উপবেশন করিয়া আছেন; ও চরণগণ স্তুতিবাক্যে এই অমরাবতী তুল্য রাজসভার সাধুবাদ করিতেছেন। এরূপ সময়ে যোধপুরের দূত প্রবেশ করিলেন।

দূত বিনীতভাবে সমস্ত সমাচার অবগত করাইলেন। যশোবন্তসিংহের পরাজয় ও দেশে প্রত্যাগমন, মহারাজ্ঞীর ক্রোধ ও রাজার দুর্দ্দশা, এই সমস্ত অবগত করাইয়া যোধপুরের মন্ত্রীর পত্র রাণার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাণা রাজসিংহ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া যশোবন্তের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া দূতগণকে বিদায় করিলেন ও তাঁহাদের উদয়পুরে থাকিবার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারিত করিতে মন্ত্রীবরকে আদেশ করিলেন। অল্পদিন পরেই যোধপুর-রাজ্ঞীর মাতা উদয়পুর হইতে যোধপুরে গমন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে কয়েক মাস বাস করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। হেমের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছিল, হেমের চিন্তা তিরোহিত হইবার নহে; তথাপি সেই বীরদেশে সেই সুন্দর উপত্যকায় বাসকালীন সে চিন্তাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব হইল। উদয়পুর হইতে অল্প দূরে অনেক অনেক যুদ্ধস্থান, অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ, অনেক পূজাস্থান আছে; নরেন্দ্র একে একে সমুদায় সন্দর্শন করিতে

লাগিলেন। কখন একাকী, কখন দেওয়ানাকে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্র নানা পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতেন, হ্রদের এক অংশ হইতে অন্য অংশ, এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বত, এক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্য যুদ্ধক্ষেত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। এক একটী পর্ব্বত নরেন্দ্রনাথের পক্ষে রাজপুতের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া বোধ হইত; তিনি কখন কখন প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক একটী নিস্তব্ধ উপত্যকায় বিচরণ করিতেন, বা একটী কীর্ত্তিস্তম্ভের নিকট উপবেশন করিয়া থাকিতেন। প্রাতঃকালে ক্রীড়াসক্ত রাজপুত বালকগণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই অপরিচিত ভ্রমণকারীকে দেখাইত; সায়ংকালে রাজপুত মহিলাগণ কলসকক্ষে হ্রদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সেই বিদেশীকে চরণ বিবেচনায় প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত। দেওয়ানাও নিস্তব্ধে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিত; নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া আনিয়া দিত; ও সায়ংকালে নৌকা আনিয়া আপনি দাঁড় ধরিয়া প্রভুকে উদয়পুরে পুনরায় লইয়া যাইত। নিস্তব্ধ শান্ত হ্রদের উপর দিয়া ধীরে ধীরে নৌকা ভাসিয়া যাইত; সে শান্ত সায়ংকালীন আকাশ, নিস্তব্ধ পর্ব্বতরাশি, ও নির্ম্মল শব্দশূন্য হ্রদ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় শান্তিরসে পরিপূর্ণ হইত, ও গভীর অনন্ত চিন্তায় মগ্ন হইয়া প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য অনুকরণ করিত। কখনও বা দেওয়ানার হৃদয় কোন নূতন অনিশ্চিতভাবে উথলিলে সে সপ্তস্বরে গীত আরম্ভ করিত, সে বালক-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুবিমল স্বরে সেই নৈশহ্রদ, পর্ব্বতরাশি ও আকাশমণ্ডল ভাসিয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধে সেই গান শুনিতেন, আর তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব কথা জাগরিত হইত। তাতার ভাষায় গীত, সে গান নরেন্দ্র বুঝিতে পারিতেন না, তথাপি দুই একটী কথা শুনিয়া বোধ হইত যেন সে প্রেমের গান। অভাগা উন্মত্ত বালক! তুই এই বয়সে কি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিস? না হইলে সে দেওয়ানা কেন, তাহার চক্ষু এরূপ অস্বাভাবিক জ্যোতিতে জ্বলিতেছে কেন, সে দেশ, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্ত হইয়া দেশে দেশে বিচরণ করে কেন? নরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত ভৃত্য!

রজনীযোগে চন্দ্রালোকে সেই হ্রদের নির্ম্মল জল বড় সুন্দর শোভা পাইত। জলহিল্লোলে চন্দ্রের আলোক বড় সুন্দর নৃত্য করিত; বায়ু রহিয়া রহিয়া সেই সুন্দর ঊর্ম্মিশ্রেণীকে চুম্বন করিয়া যাইত। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এ সমস্ত দেখিতেন না। নৌকার উপরে শয়ান হইয়া চারিদিকের সেই অনন্ত পর্ব্বতরাশি দেখিতেন; অনন্ত আকাশে নির্ম্মল নীল আভা দেখিতেন;

দুই একখানি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র মেঘ দেখিতেন। দেখিতেন আর কত চিন্তা করিতেন। কখন বা হেমলতার চিন্তা করিতেন, কখনও বা বঙ্গদেশের অনাথ অবস্থার বিষয় ভাবিতেন, কখন বা অনন্ত রাজপুত-গৌরব ও রাজপুত-পর্ব্বতের বিষয় চিন্তা করিতেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার বালক বসিয়া থাকিত, কখন আপন অঙ্কে নরেন্দ্রের মস্তক স্থাপিত করিয়া বসিত; সে'ও আকাশের দিকে, চন্দ্রের দিকে চাহিত আর গভীর চিন্তা করিত।—কি চিন্তা? দেওয়ানার কি চিন্তা কে বলিবে?

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। ক্রমে আশ্বিন মাসে অম্বিকা-পূজার সময় সমাগত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শারদীয়া পূজা।

শরৎকাল উপস্থিত, গ্রীষ্মের তেজ আর নাই; বর্ষার জল অপসৃত হইয়াছে এবং মেদিনী বর্ষা-স্নানের পর দ্বিগুণ শোভায় হরিৎ পরিচ্ছদে দৃষ্ট হইতেছে। বীরস্থান, রাজপুতানায় এই সময়ে যুদ্ধ আরম্ভের সময়, সুতরাং রাজস্থানে অম্বিকার পূজার সহিত খড়্গের পূজা হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে উপর্য্যুপরি দশ দিন নরেন্দ্রনাথ যেরূপ ঘটা ও সমারোহে যেরূপ উৎসাহ দেখিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। পূর্ব্বপুরুষগণ যে সমস্ত অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন, বীরগণ এখন মহা উৎসাহে সেই সমস্ত অস্ত্র আয়ুধশালা হইতে বাহির করিয়া মহাসমারোহে তাহার পূজায় রত হইলেন। দেবীর মন্দিরে প্রতিদিন মহিষ ও মেষ বলি হয়, রঙ্গস্থানে যোদ্ধাগণ প্রতিদিন একত্রিত হইয়া আপন আপন যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করেন ও মহা উৎসাহ ও বীরদর্পে কালহরণ করেন। দশম দিবসে মহাসমারোহে দুর্গার পূজা হইল; তাহার পরদিবসে মহারাণা সমস্ত যোদ্ধা বীরগণকে আহ্বান করিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। সে দিনের সমারোহ দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। সমস্ত উদয়পুর যেন নূতন শোভায় শোভিত হইয়াছে; বাজার, দোকান, পথ, ঘাট, আজি পুষ্পমালা ও বৃক্ষশাখায় পরিশোভিত হইয়াছে; বহুমূল্য সাটীন ও জরীর চন্দ্রাতপে পথ ও গৃহ আচ্ছাদিত হইয়াছে; দ্বারে দ্বারে সুন্দর ও সুশোভিত তোরণ দৃষ্ট হইতেছে; গৃহে গৃহে বিজয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে; প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি এই সমস্ত সুন্দর দ্রব্যের উপর খেলিতেছে; সহস্র জয়ঢাকের শব্দে রাজপুত বীর

ও সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া রঙ্গস্থলে গমন করিতেছে; উদয়পুরের অধীনস্থ নানাস্থান হইতে অনেক বীর অদ্য নিজ নিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া সমবেত হইয়াছে; নানা লোকের নানারূপ অশ্ব, নানারূপ পরিচ্ছদ, নানারূপ পতাকা ও বাদ্যযন্ত্র ও নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র আজি উদয়পুরে সম্মিলিত হইয়াছে। পঞ্চদশ সহস্র বীরপুরুষ আজি মহারাণাকে বেষ্টন করিয়াছে ও মহারাণার আদেশে স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কে না জানে উদয়পুরের সৈন্যের পদভরে দিল্লীর সিংহাসন সমগ্র ভারতবর্ষ, শত বার কম্পিত হইয়াছে!

বেলা এক প্রহর হইতে হইতে সকলেই রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন, ও তথায় সকলেই নিজ নিজ বীরত্ব, নিজ নিজ যুদ্ধকৌশল, অশ্বচালনে বা অস্ত্রচালনে কৌশল দেখাইতে লাগিলেন। পঞ্চদশ সহস্র বীরগণের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল, তাহাদের জয় জয় ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে রঙ্গস্থানের শোভা কে বর্ণনা করিতে পারে? তাহার মধ্যে চরণগণ আসিয়া রাজসম্মুখে নিজ নিজ কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিরূপে সমরসিংহ ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুতের সহিত স্বদেশরক্ষার্থ কাগার নদীকূলে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিরূপে কুম্ভ বাহুবলে দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, কিরূপে সংগ্রামসিংহ দিল্লীশ্বর বাবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিরূপে প্রতাপসিংহ ক্রমান্বয়ে বিংশতি বৎসর পর্ব্বতকন্দরে বাস করিয়াও মহাবল পরাক্রান্ত আকবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত অনন্ত গীত আজি উদয়পুরের রঙ্গস্থলে গীত হইতে লাগিল। চরণের গীত সমাপ্ত হইল; রাণা লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া অসি নিষ্কোষিত করিলেন, একেবারে পঞ্চদশ সহস্র অসি নিষ্কোষিত হইল, পঞ্চদশ সহস্র বীর পুরুষের জয় জয় নাদে আকাশ বিদীর্ণ হইল। তাহার পর রাজপুতগণ আবার যুদ্ধলীলায় লিপ্ত হইলেন। নরেন্দ্রনাথও তাহাদিগের সহিত মিলিলেন।

নরেন্দ্রনাথ অশ্বে আরোহণ করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কেবল একমাত্র ভৃত্য আসিয়াছিল; সে অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নরেন্দ্রের বর্শা লইয়া আসিতেছিল। নরেন্দ্র সেদিনকার যুদ্ধলীলায় আপন রণকৌশল প্রকাশ করিলেন, কোন কোন রাজপুতকে পরাস্ত করিলেন, কাহারও বা নিকট পরাস্ত হইলেন, অবশেষে অশ্বকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিবার জন্য দ্বিপ্রহরের সময় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিলেন; ভৃত্য অশ্বকে বৃক্ষের এক পার্শ্বে বাঁধিল।

পরে ভৃত্য নিকটস্থ একটী ঝরণা হইতে নরেন্দ্রের জন্য জল আনিতে গেল। অচিরাৎ ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর নিকট আবেদন করিল, যে ঐ ঝরণার নিকট এক জন অশ্বারোহী আমাকে জল লইতে নিবারণ করিল; কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, "বীরপুরুষ ভিন্ন এ অমৃতবারি পান করিবার অধিকার কাহারও নাই, বঙ্গবাসী প্রথমে বীরপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিন, পরে জলপান করিতে পারিবেন।"

শুনিবামাত্র নরেন্দ্র ক্রোধে আরক্তবদন হইয়া লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন ও সেই জলপ্রপাতের নিকট যাইলেন। দেখিলেন একটী প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে এক জন প্রকাণ্ড কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা বসিয়া রহিয়াছেন। যোদ্ধার মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষ। যোদ্ধার বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনও নয়ন জ্যোতিঃ-পূর্ণ ও শরীর দেখিলে অসীম বলবান বলিয়া বোধ হয়।

নরেন্দ্র কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার বীরত্বের প্রমাণ চাহিয়াছিলেন?"

কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা উত্তর না করিয়া দুইখানি যষ্টি দুই হাতে ধরিয়া বলিলেন, "একটী বাছিয়া লউন।" নরেন্দ্র একটী বাছিয়া লইলেন।

দুই জন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একেবারে বেগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, ক্ষণকাল তাহাদের কাহাকেও ভাল করিয়া দেখা গেল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে নরেন্দ্র পরাজিত হইলেন; সেই অপূর্ব্ব বলবান যোদ্ধার সজোর আঘাতে নরেন্দ্রের ঢাল চূর্ণ হইয়া গেল, নরেন্দ্রের যষ্টি হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, নরেন্দ্র স্বয়ং ভূমিতে নিপতিত হইলেন। চারিদিকে যোদ্ধাগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

নরেন্দ্র স্বাভাবিক ক্রুদ্ধস্বভাব, এক্ষণে ক্রোধে একেবারে অন্ধ হইলেন। দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া আপন কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধার শরীরে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজপুত অবহেলায় ঢাল দ্বারা আপন শরীর বাঁচাইলেন, আবার যোদ্ধাগণ হাস্য করিয়া উঠিল।

তখন রাজপুত ঈষৎ হাসিয়া নরেন্দ্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,"আমার হস্তে যষ্টিমাত্র, আপনার যুদ্ধখড়্গ ব্যবহার করা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই; তবে স্ত্রীলোক ও বঙ্গদেশীয় যাহাই করে তাহাই মার্জ্জনীয়।"

এই ব্যঙ্গোক্তিতে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্র কর্কশভাবে বলিলেন, "আমার উপহাস করিবার সময় নাই, আপনার যুদ্ধখড়্গ বাহির করুন।"

কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা উত্তর করিলেন, "বালক! এই বয়সেই কেন প্রাণ হারাইবে? যষ্টি ধারণ কর তাহাই তোমাকে সাজে, যথার্থ যুদ্ধব্যবসায় তোমাকে সাজে না।"

নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাজপুতকে আক্রমণ করিলেন। তখন রাজপুত তিনহস্তপরিমিত আপন যুদ্ধখড়্গ বাহির করিলেন, সূর্য্যালোকে সে অসি ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিল। অধিকক্ষণ যুদ্ধ হইল না; কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা অকাতরে এক আঘাতে নরেন্দ্রের অসি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; দ্বিতীয় বার তাহার অসি উন্নত হইয়াছে, নরেন্দ্র জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন সময়ে এক দিকে একটী চীৎকার শব্দ হইল, রাজপুত সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়া অসি আপন কোষে রাখিলেন; নরেন্দ্র সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার অনুচর দেওয়ানা চীৎকার করিয়াছিল। দেওয়ানার আগমনে তাঁহার জীবনরক্ষা হইল, নরেন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু সেই তাতার বালকের চীৎকার শুনিয়া রাজপুত কেন তাহাকে বধ করিতে নিরস্ত হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি রাজপুতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, তিনি নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার মুখমণ্ডল স্থির ও গম্ভীর, এইক্ষণেই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাহাকে দেখিলে তাহা কোন ক্রমেই বোধ হয় না।

নরেন্দ্র কর্কশস্বরে বলিলেন, "রাজপুত! আমি তোমার নিকট জীবনভিক্ষা চাহি না; তোমার যাহা ইচ্ছা, যাহা সাধ্য কর, আমি অনুগ্রহ চাহি না।"

কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—"আমি এক্ষণে ব্যঙ্গ করিতেছি না, আপনি যথার্থ বীর আপনার বীরত্ব দেখিয়া আমি তুষ্ট হইলাম। আমিও যুদ্ধব্যবসায় করিয়া থাকি, যোদ্ধার নিকট ভিক্ষা চাহিতে যোদ্ধার কোন অপমান নাই। তিন দিবসের মধ্যে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে, সে দিন আমি আপনার নিকট একটী ভিক্ষা করিব। আমার নাম শৈলেশ্বর।"

নরেন্দ্রকে উত্তর দিবার সময় না দিয়াই শৈলেশ্বর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইলেন। দেওয়ানাকে নিকটে ডাকিয়া সে অদ্য রঙ্গস্থলে কখন আসিয়াছিল, কি জন্য আসিয়াছিল, কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধাকে পূর্ব্বে জানিত কি না, কেনই বা যোদ্ধা তাহার চীৎকার শুনিয়া যুদ্ধে নিরস্ত হইল, প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু

দেওয়ানা জ্ঞানশূন্য; সে কোন কথার উত্তর দিতে পারে না। নরেন্দ্র দেখিলেন দেওয়ানাকে জিজ্ঞাসা করা ব্যর্থ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবমন্দির।

রাজস্থানে নূতন নূতন দেশ নূতন নূতন আচার ব্যবহার দেখিয়া নরেন্দ্রনাথেব হৃদয় কিছুদিন শান্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রস্তরে যে অঙ্ক খোদিত হয়, জলে বা অগ্নিতে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় না। বঙ্গদেশ হইতে উদয়পুর শত শত ক্রোশ অন্তর, কত নদ, নদী, পর্ব্বত, মরুভূমি পার হইয়া নরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। তথাপি প্রাতঃকালে যখন পূর্ব্বদিকে আকাশে রক্তিমাচ্ছটা অবলোকন করিতেন, তখন সেই পূর্ব্বদেশবাসিনী উজ্জ্বলতর সৌন্দর্য্যচ্ছটা নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরিত হইত। গভীর রজনীতে যখন নরেন্দ্রনাথ একাকী ছাদের উপর অন্ধকারে বিচরণ করিতেন, বোধ হইত যেন সেই প্রণয়প্রতিমা তারার জ্যোতিতে নরেন্দ্রনাথের উপর প্রেমদৃষ্টি করিতেছে! কোথায় বীরনগরের বাটী, কোথায় কলনাদিনী ভাগীরথী, আর কোথায় নরেন্দ্রনাথ? কিন্তু স্বদেশ হইতে পলায়ন করিলে কি চিন্তা হইতে পলায়ন করা যায়? মৃত্যুর আগে আর একবার সেই হেমলতাকে দেখিবেন; প্রাতে, সায়ংকালে, দ্বিপ্রহরে, নিশীথে তিনি যে চিন্তা করেন, হেমলতাকে একবার সেই সমস্ত কথা বলিবেন, নরেন্দ্রনাথের কেবল এই ইচ্ছা। মৃত্যুর আগে কি আর একবার দেখা হইবে না? নরেন্দ্রনাথ দেওয়ানার নিকট শুনিলেন, যে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরের কোন কোন গোঁসাই ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন; নরেন্দ্রনাথ একদিন সেই মন্দিরে যাত্রা করিলেন।

রজনী এক প্রহরের পর মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন, ও মন্দিরের যে শোভা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। সে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; রহিয়া রহিয়া শীতল বায়ু ঝটিকাবেগে প্রবাহিত হইতেছে। মন্দির একটী উপত্যকাস্থিত ছিল, তাহার চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, কেবল উচ্চ প্রকাণ্ড অন্ধকারময় পর্ব্বতরাশি অন্ধকার আকাশের সহিত মিশ্রিত

হইয়াছে; চারিদিকে যেন প্রকৃতি অলঙ্ঘনীয় ভীষণ প্রাচীর দিয়া ভীষণ রুদ্রের উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছেন; সেই প্রাচীরের উপর গভীর কৃষ্ণবর্ণ দূরবিলম্বী বজ্রনাদী ঘন ঘনরাশি ছাদস্বরূপ লম্বিত রহিয়াছে; রুদ্রের উপযুক্ত চন্দ্রাতপ! আকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত এক এক-বার বিদ্যুল্লতা চমকিত হইতেছে। সেই ক্ষণস্থায়ী আলোকে চারিদিকের বস্তু এক একবার দেখা যাইতেছে। দূর পর্ব্বতের শেখর চারিদিকে গগন বিদীর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধবাহুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখা যাইতেছে; কাল মেঘের উপর কাল মেঘ যেন রাশীকৃত হইয়াছে দেখাইতেছে; মন্দিরের নিকটে বিশাল অন্ধকারাচ্ছন্ন আম্রকানন দৃষ্ট হইতেছে, আর সেই প্রশান্ত প্রকাণ্ড শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত উন্নত দেবালয় দৃষ্ট হইতেছে। আবার গভীর অন্ধকার, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্ধকার; কেবল শ্বেত মন্দির ও চারিদিকে ভীষণ অচলপ্রাচীর অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কেবল প্রবল বাত্যা, প্রবল উচ্ছ্বাসরব শুনা যাইতেছে; কেবল নিকটস্থ বেগবাহিনী প্রস্রবণ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নিপতিত হইতেছে, তাহারই বজ্রনাদ শুনা যাইতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে বিদ্যুতের উপযোগী বজ্রনাদ শুনা গেল, কড় কড় শব্দে আকাশ, পর্ব্বত, উপত্যকা, প্রতিধ্বনিত করিল, এবং ভীত ও স্তম্ভিত জগতে রুদ্রতেজ প্রচারিত করিল।

নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই ভীষণ শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির এ মহিমা দেখিয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত জগৎসংসার ও পার্থিব বিষয় বিস্মৃত হইলেন। আজি নরেন্দ্রনাথের হৃদয় শান্ত, সংসার-চিন্তাশূন্য! অচকিতনয়নে তিনি বিদ্যুতের বিকট শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, অকম্পিতহৃদয়ে বজ্রের ভীষণ নাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে অন্ধকার, নরেন্দ্র একাকী সেই গভীর রজনীতে মন্দিরপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তমসাচ্ছন্ন অভ্রভেদী পর্ব্বতমালার দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, যেন প্রকৃতির উদ্বেগ দেখিয়া আজি তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় নরেন্দ্র সেই প্রকাণ্ড মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখনও প্রবল বাত্যা ও ঘন বিদ্যুৎ থামে নাই। সারি সারি শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর স্তম্ভের মধ্য দিয়া সেই বিস্তীর্ণ প্রস্তরালয়ে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে মহাদেবের যণ্ড ও নন্দির পৈত্তল প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, ভিতরে শুভ্র প্রকোষ্ঠ ও স্তম্ভসার উজ্জ্বল সুগন্ধ দীপাবলিতে ঝলমল্ করিতেছে; মধ্যে ভোলানাথের প্রস্তরবিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

রহিয়াছে। মন্দিরের একজন দীর্ঘকায় তেজস্বী জটাধারী গোস্বামী এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া মুদিতনয়নে তপ করিতেছেন, প্রশস্ত ললাটে অৰ্দ্ধশশাঙ্কের ন্যায় চন্দনরেখা, বিশাল স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। অন্য দুই চারি জন গোস্বামী এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছেন। আজি এই দুর্য্যোগে অধিক যাত্রী আইসে নাই। ঐ মন্দিরের প্রধান গোস্বামী চিরকাল অবিবাহিত থাকেন, তাঁহার মৃত্যুর পর শিষ্যের মধ্যে একজন ঐ পদে নিযুক্ত হন। মন্দিরের সাহায্যার্থে অনেকসংখ্যক গ্রাম নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাহা ভিন্ন যাত্রিদিগের দানও অল্প ছিল না।

সহসা দ্বিপ্রহরের ঘণ্টারব সেই সুন্দর শিলা-মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল; তৎক্ষণাৎ যোগ-রত গোস্বামী নয়ন উন্মীলিত করিয়া ইঙ্গিত করিলেন; বম্‌বম্‌ হর হর শব্দে মন্দির পরিপূরিত হইল, ও তৎপরে যন্ত্র-সম্মিলিত উচ্চ গীতধ্বনিতে ভোলানাথের স্তব আরম্ভ হইল। জগদ-বিমোহিনী অপ্সরতুল্যা প্রৌঢ়যৌবনসম্পন্না নৰ্ত্তকীগণ তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল; গায়কগণ সপ্তস্বরে মহাদেবের অনন্ত গীত গাইতে আরম্ভ করিল। সে অনন্ত গীতের সহিত বায়ু ভীষণ উচ্ছ্বাসশব্দে মিলিত হইতে লাগিল, আর মধ্যে মধ্যে বজ্রনাদ যেন সেই মহাগীত জগতে প্রচার করিতে লাগিল।

ক্ষণেক পর সে গীত সাঙ্গ হইল, সেই গোস্বামী আবার ইঙ্গিত করিলেন, নর্ত্তকীগণ দলে দলে সরিয়া গেল, গায়কগণ নিস্তব্ধ হইল, মন্দিরের দীপাবলি সহসা নির্ব্বাপিত হইল; পূজা সাঙ্গ হইল। নরেন্দ্রনাথ সে অন্ধকারে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পর বোধ হইল, যেন অন্ধকারে সেই দীর্ঘকায় গোস্বামী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ সেই দিকে যাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহাশয় কি এ মন্দিরের একজন গোস্বামী?” গোস্বামী কিছুমাত্র না বলিয়া ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,“মহাশয়, আমার সহিত কথোপকথনে অভিলাষী?” গোস্বামী পুনরায় ওষ্ঠে অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই অন্ধকারে এইরূপ লোক দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন; আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,“তবে আমাকে ইঙ্গিত করিলেন কেন?” গোস্বামী উত্তর না করিয়া অঙ্গুলী দ্বারা দূরে এক দিক নির্দ্দেশ করিলেন; নরেন্দ্র সেইদিকে চাহিলেন, নিবিড় দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; আবার চাহিলেন, বোধ হইল যেন অন্ধকারে একটী

দীপশিখা দেখা যাইতেছে। গোস্বামী নরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন; নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দুইজনে অনেক পথ সেই অন্ধকারে অতিবাহিত করিলেন। তখন আকাশ হইতে মুসলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, সময়ে সময়ে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, সে পথ জনশূন্য ও নিস্তব্ধ; কিন্তু গোস্বামী কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন; নরেন্দ্রনাথও চলিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল। এ অন্ধকারে এ মৌনাবলম্বী যোগীপুরুষ কে? ইহার উদ্দেশ্য কি? শৈবগণ কখন কখন নরহত্যার দ্বারা পূজাসাধন করে, এ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ বিকট যোগীর কি তাহাই উদ্দেশ্য? একবার নরেন্দ্রনাথ দাড়াইলেন, আবার খড়্গে হাত দিয়া ভাবিলেন, "আমি কি কাপুরুষ? এই প্রশান্তমূর্ত্তি যোগীর সহিত যাইতে ভয় করিতেছি?" আবার গোস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর শৈব গোস্বামী এক পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলেন, নরেন্দ্রও প্রবেশ করিলেন; তাহার ভিতর যাহা দেখিলেন তাহাতে নরেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইলেন।

সম্মুখে করালবদনা কালীর ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি, তাহার নিকটে কয়েকখানি সমাধিকাষ্ঠ জ্বলিতেছে, তাহার আলোক সেই গহ্বরের শিলায় চারিদিকে প্রতিহত হইতেছে। গহ্বরের ভিতর উপর হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে; অগ্নির পার্শ্বে কয়েকখানি পুস্তক, একখানি শোণিতাক্ত খড়্গ, ও স্থানে স্থানে শোণিতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। দূর-জলস্রোতের ন্যায় একটী শব্দ সেই গহ্বরে শ্রুত হইতেছিল।

গোস্বামীর আকৃতি অপূর্ব্ব। শ্বেতশ্মশ্রু বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে, শ্বেত কেশের জটাভার পৃষ্ঠে দুলিতেছে, অথচ শরীর অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় বলিষ্ঠ, অতিশয় তেজোময় বলিয়া অনুভব হয়, ও নয়নদ্বয় সেই অগ্নির আলোকে ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। উন্নত ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনরেখা শোভা পাইতেছে। নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল, যেন এরূপ অপূর্ব্ব আকৃতি তিনি কখনও দেখেন নাই।

গোস্বামী পদাঘাতে জ্বলন্তকাষ্ঠ নির্ব্বাণ করিলেন; পরে তাহার অপর পার্শ্বে যাইয়া সেই রক্তাক্ত খড়্গ হস্তে তুলিয়া লইলেন; বিকীর্ণ অগ্নিকণাতে তাঁহার মুখমণ্ডল ও দীর্ঘ অবয়ব আরও বিকট বোধ হইল; নরেন্দ্রনাথের

হৃদয় স্তম্ভিত হইল ; তিনি অগত্যা একপদ পশ্চাতে যাইয়া শিলারাশিতে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন ; অগত্যা তিনি কোষ হইতে অসি বাহির করিলেন, সাহসে ভর করিয়া তখন তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃৎকম্প একেবারে অবসান হইল না।

অতি গম্ভীরস্বরে গোস্বামী ডাকিলেন, " নরেন্দ্রনাথ ! "

নরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন, শৈব সেই উদয়পুরের কৃষ্ণপরিচ্ছদ যোদ্ধা—শৈলেশ্বর !

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতগহ্বর।

তখন নরেন্দ্রনাথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। "এ অপরিচিত যোগী আমার নাম কিরূপে জানিল ; কিজন্য এই ভীষণ স্থানে আমাকে এই ভীষণ স্বরে আহ্বান করিল ?" নরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগে অস্থির হইল, কিন্তু চিন্তার সময় ছিল না। শৈলেশ্বর আবার বলিলেন—

"নরেন্দ্রনাথ ! ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে গোস্বামীগণ যোগবলে মানব-হৃদয় জানিতে পারেন ; নরেন্দ্রনাথ ! তুমি পাপ-হৃদয়ে এ পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছ ?"

নরেন্দ্রনাথ অধোবদনে রহিলেন। পুনরায় শৈলেশ্বর অতি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"নিরুত্তর হইলে কি জন্য ? নিজ পাপমুখে পাপকথা বিস্তার করিয়া বল ; পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই।"

এই ভয়াবহ আদেশ শুনিয়া নরেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইলেন ; কিন্তু তিনি ভীরু ছিলেন না, কর্কশভাবে উত্তর করিলেন—

"আপনি কে জানি না, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি।"

শৈল। "আমি ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরের গোস্বামী, সে মন্দির-কলুষিতকারিকে প্রশ্ন করিবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

নরেন্দ্র। "আমি মহেশ্বর মন্দিরের গোস্বামীকে এইমাত্র উত্তর করিব, যে গোস্বামিগণ যদিও রমণী-প্রেমে বঞ্চিত, তথাপি রমণী-প্রেম-আকাঙ্ক্ষা পাপ নহে ; স্বয়ং শূলপাণি অপর্ণার প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেন।"

গোস্বামী বজ্রনাদে উত্তর করিলেন, "নরেন্দ্র ! এ প্রবঞ্চনার স্থান নহে ; তুমি কেবল রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহ, পাপিষ্ঠ ! তুমি পরস্ত্রীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী ;

জগতে এরূপ যন্ত্রণা কি আছে, নরকে এরূপ অগ্নি কি আছে, যাহাতে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় ?" সে ভীষণ শব্দ পর্ব্বতগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইল। নরেন্দ্র আবার অধোবদনে রহিলেন ; শৈলেশ্বর বলিতে লাগিলেন—

"নরেন্দ্রনাথ ! আপনাকে ভুলাইও না, জগৎকে ভুলাইও না ; যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর, সেই সুন্দর জাহ্নবীকূলে সেই সুন্দর অট্টালিকা স্মরণ কর। পবিত্রাত্মা শ্রীশচন্দ্র, পবিত্রা হেমলতা, পবিত্র সংসার ! পাপিষ্ঠ ! তোমার মনোরথ কি ? সেই সংসার ছারখার হয়, সেই শ্রীশচন্দ্রের সর্ব্বনাশ হয়। আহা ! সেই শ্বেত-পদ্ম-সন্নিভা পবিত্রা হেমলতা বাল্যকালে যে তোমার সহিত খেলা করিয়াছিল, এখনও সহোদরা অপেক্ষা তোমাকে যে স্নেহ করে, তোমার জন্য যে চিন্তা করে, সেই স্নেহময়ী পতিব্রতা নারী কুলটা হইয়া তোমাকে সেবা করে ! সতীর ললাটে কুলকলঙ্কিনী দুশ্চারিণী শব্দ অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হয় ; তাঁহার দুগ্ধফেননিভ শ্বেত যশে অঙ্গারবর্ণ দেদীপ্যমান্ হয় ; ঘোর পাপিষ্ঠ ! তোমার জন্য সে সোণার সংসার, সে পবিত্রা পতিব্রতা নারী, সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ! হা নরেন্দ্রনাথ ! আপনাকে ভুলাইও না ; সত্য তুমি এতদূর ভাব নাই, কিন্তু তোমাব মনোরথ পূর্ণ হইলে ইহা ভিন্ন আর কি ফল হয় ? এই কাল মনোরথে তুমি এই পবিত্র মন্দিরে আসিয়াছ।"

কথা সাঙ্গ হইল ; কিন্তু সে বজ্রধ্বনি তখনও কর্ণমূলে কম্পিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছিল, চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার কর্কশভাব লীন হইল, নয়ন হইতে দুই একটী অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

"স্বামিন্ ! আমি একবার আত্মরক্ষার জন্য এই গহ্বরে প্রবেশ করিয়াই অসি বহিষ্কৃত করিয়াছিলাম ; এই সে অসি গ্রহণ করুন ; আমার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া এই অগ্নিতে নিক্ষেপ করুন ; আমার মত ঘোর পাপিষ্ঠের নরকেও প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

শৈলেশ্বর তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "বৎস ! এ সংসারে এরূপ ব্যাধি নাই, যাহার ঔষধ নাই ; এরূপ পাপ নাই, যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই ; আমি তোমার সংশোধনকামনা করি, সংহারকামনা করি না।"

নরে। "স্বামিন্ ! আমি এ দয়ার উপযুক্ত নহি ; যে পাপিষ্ঠ হেমলতার ন্যায় পবিত্রপুত্তলীকে কলুষিত করিবার মানসে দেবালয়ে আইসে, তাহার ইহজীবনে প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

শৈল। "নরেন্দ্র, তুমি যতদূর এক্ষণে বিবেচনা করিতেছ ততদূর পাপী নহ। আমার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। তুমি হেমলতাকে পাইবার মানস কর নাই; একবার দেখিবে, জীবনে আর একবার দেখিবে, এইরূপ মানস প্রকাশ করিয়াছিলে; সেই মানসেই দেবালয়ে আসিয়াছিলে।"

গোস্বামী যোগবলে এতদূর জানিয়াছেন দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন; তাঁহার হৃদয়ও কিছু শান্ত হইল। বলিলেন—

"প্রভো! আপনি যাহা আদেশ করিলেন যথার্থ, হেমলতার হানি করা দূরে থাক, তাঁহার শরীরের একটী কণ্টক বিমোচন করিবার জন্য আমি জীবন দিতে পারি, ভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি তাহা জানেন।"

শৈল। "তবে তাহার হৃদয়ে যে কণ্টকটী তুমিই স্থাপন করিয়াছ সেটী তুলিতে যত্নবান্ কেন না হও?"

নরে। "কিরূপে? আদেশ করুন।"

শৈল। "বাল্যকালাবধি তুমি তাঁহার হৃদয়ে প্রেমস্বরূপ কণ্টক রোপণ করিয়াছ, সেটী তুমি উৎপাটন কর; না হইলে তাহা উৎপাটিত হইবে না। হেমলতা জীবন্মৃতা থাকিবে। হেমলতা এক্ষণে সচ্চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ স্বামী পাইয়াছেন, সংসারকার্য্যে বিব্রত হইয়াছেন, কেবল তুমি কোথায় আছ, কি করিতেছ, এই চিন্তা এক একবার তাঁহার মনে হয়, কেবল সেই সেই সময়ে স্বামীর প্রতি হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতিনী হয়েন। সেই চিন্তা তুমি দূর কর।

নরে। "কিরূপে দূর করিব? আমি তাঁহার নিকটে থাকিলে কি সে চিন্তা দূর হইবে?"

শৈল। "হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে এখনও যেরূপ উদ্বেগ, তাহা দেখিয়া হেমলতার পূর্ব্বের উদ্বেগ আবার সজীব হইতে পারে।"

নরে। "স্বামিন্! তবে কি করা উচিত? আমি দূরে থাকিলে হেম আমার চিন্তা করিবে, নিকটে থাকিলে আবার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইবে। তবে কি উপায় নাই?"

শৈল। "উপায় আছে। নিকটে থাকিবে; কিন্তু হেমলতার সহিত একেবারে চিরজন্মের বিচ্ছেদ ঘটান আবশ্যক। নরেন্দ্র যদি যথার্থ হেমকে ভাল বাস, যদি যথার্থ তাহার কণ্টকোদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে সম্মত থাক, তবে আমার পরামর্শ গ্রহণ কর। বিধর্ম্মী হও; মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন কর; মুসলমানকন্যা বিবাহ কর, তোমার পূর্ব্ব স্বামী সুজার অধীনে পুনরায়

কার্য্য কর। হেম যখন শুনিবে, যে নরেন্দ্র আমার বাল্যকালের ভালবাসা ভুলিয়া অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছেন, মুসলমান হইয়া মুসলমান সুবাদারের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন ; তখন অবশ্যই তাঁহার হৃদয় ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইবে। মানব-হৃদয় লতার মত শুষ্ককাষ্ঠে জড়াইয়া থাকে না। যে আমাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে, যাহার অন্য আশা, অন্য প্রেম, অন্য উদ্দেশ্য, অন্য চিন্তা, তাহার প্রতি অনুরক্তি কখনই চিরকাল থাকে না। নরেন্দ্র! তোমার বিষম পাপের এই বিষম প্রায়শ্চিত্ত।"

নরেন্দ্রের মস্তকে যেন সহসা বজ্রপাত হইল। তিনি অনেকক্ষণ বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন, অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভগবন্! রক্ষা করুন এ বিষম প্রায়-শ্চিত্তে আমি অশক্ত ; আমি জলমগ্ন হইব, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব ; আমি অন্য কন্যা পরিগ্রহ করিতে পারিব না।"

শৈল। "স্বার্থপর! তুমি অগ্নিপ্রবেশ করিলে তোমারই যন্ত্রণা শেষ হইবে, হেমের কি হইবে? যখন হেম শুনিবে তুমি তাহার জন্য অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছ, তখন তাহার পূর্ব্ব ভালবাসা, পূর্ব্বশোক শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে ; অভাগিনী চিরকালের জন্য শতগুণ হতভাগিনী হইবে। নরেন্দ্রনাথ, এই জন্য কি বলিয়াছিলে হেমের উপকার করিতে তুমি ক্লেশ স্বীকার করিতে পার?"

নরে। "ভগবান জানেন আমি তাহার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু আপনি যে ব্যবস্থা করিলেন সে অসহ্য। স্বামিন্! এ ঔষধ অতিশয় তিক্ত, অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করুন।"

শৈল। "উৎকট রোগে উৎকট ঔষধ আবশ্যক।"

নরে। "স্বামিন্! আপনি পরম ধার্ম্মিক শৈব হইয়া আমাকে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার আদেশ করিতেছেন?"

শৈল। "পাপের জন্য মনুষ্য গোজন্ম পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়, কেবল জাতিনাশে ভীত হইতেছ?"

দুই জনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; নরেন্দ্রনাথ হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দিকে চাহিয়া একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; শৈলেশ্বর সেই পর্ব্বতগহ্বরে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর শৈলেশ্বর গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"নরেন্দ্রনাথ, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর?"

নরে। "না বিশ্বাস করিলে নিজ খড়্গ স্বামীর হস্তে দিতাম না।"

শৈল। "তবে একটী কথা শুন। প্রেম নারীর একমাত্র অবলম্বন, প্রেম নারীর জীবন; পুরুষের তাহা নহে। পুরুষের অনেক আশা আছে, অনেক অভিলাষ, অনেক মহৎ উদ্দেশ্য আছে; তুমি যুবক, সাহসী অভিমানী; এ প্রশস্ত জগতে কি আপন অসি সহায় করিয়া আপনার যশের পথ পরিষ্কার করিতে পারে না? স্ত্রীলোকের মত কি কেবল ক্রন্দনে জীবন অতিবাহিত করিবে? শুনিয়াছি তোমার বঙ্গদেশ বীরশূন্য, যশঃশূন্য। যাও, নরেন্দ্রনাথ! সেই দূর বঙ্গদেশে যশঃস্তম্ভ স্থাপন কর, যাও স্বদেশের গৌরব সাধন কর, সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপন কর। এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার জীবন সমর্পণ কর। আকাশে এরূপ দেবতা নাই, যিনি এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমাকে সহায়তা না করিবেন। স্বয়ং বজ্রপাণি পুরন্দর, স্বয়ং শূলপাণি মহাদেব, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। জগৎ-বিহারী বায়ু দেশে দেশে তোমার যশোগান বিস্তার করিবে!"

শৈলেশ্বর নিস্তব্ধ হইলেন; নরেন্দ্রের নয়নদ্বয় ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, তিনি একদৃষ্টিতে সেই অপূর্ব্ব শৈবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে একদিন এই শৈবকে যেরূপ যুদ্ধনিপুণ দেখিয়াছিলেন, অদ্য মানব-হৃদয় জ্ঞানে তাঁহাকে সেইরূপ নিপুণ দেখিলেন। শৈব আবার বলিতে লাগিলেন—

"ঐ শুন ভীষণ বজ্রনাদ, ঐ ভীষণ বায়ুর শব্দ; এইরূপ রজনীতে তুমি বিদেশে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছ! কি জন্য? দেশের হিতসাধনের জন্য আসিয়াছ? কোন্ বীরব্রতে ব্রতী হইয়া আসিয়াছ? কোন্ দেবোচিত মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ আসিয়াছ? ধিক্ নরেন্দ্র! তোমার ন্যায় বীরপুরুষ একটী বালিকার মুখ দেখিবার জন্য জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া থাকে? প্রেমচিন্তা দূর কর; অথবা যদি সে চিন্তা দূর করিতে না পার, এরূপ প্রণয়নিগড়ে বদ্ধ হও, যদ্দ্বারা মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। পুরুষসিংহ! সিংহী গ্রহণ কর।"

নরে। "ভগবন্, আদেশ করুন।"

শৈল। "এ জগৎ অনুসন্ধান কর; প্রাণ অপেক্ষা তোমাকে ভাল বাসিবে, পীড়ার সময় সাবিত্রীর ন্যায় তোমার সেবা করিবে, যুদ্ধের সময় নৃমুণ্ডমালিনীর ন্যায় তোমার পার্শ্বে অসিহস্তে দাঁড়াইবে, কুশলের সময় পরিমল প্রণয়দানে তোমার হৃদয় তৃপ্ত করিবে, বিপদের সময় যশোগীতে তোমার শরীর কণ্টকিত করিবে; এরূপ রমণী যদি পাও, তাহাকে গ্রহণ কর।"

নরে। এরূপ নারী কি জগতে আছে ?"

শৈল। "স্বয়ং দেখিতে পাইবে। নরেন্দ্র! আমার যোগবল মিথ্যা নহে, এরূপ নারী না থাকিলে আমি বৃথা তোমাকে এই গহ্বরে আহ্বান করি নাই; আর একটী কথা শুন; যে নারীর কথা আমি বলিতেছি, সে হেমলতা অপেক্ষা তোমাকে ভালবাসে; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি কিন্তু মানবী-হৃদয়ে এরূপ গভীর প্রেম থাকে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। এ নারীকে পূর্ব্বে তুমি দেখিয়াছ।"

নরে। "স্মরণ নাই।"

শৈল। "অদ্য স্বপ্নে দেখিবে। আমি চলিলাম, এই কলসে যে মদিরা আছে, তাহা পান করিয়া আজ এই গহ্বরে শয়ন কর। এই নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নির দিকে দেখ, যখন শেষ অগ্নিকণা সমস্ত ভস্ম হইয়া যাইবে, তখন সেই স্বপ্ন দেখিবে। যে নারীকে দেখিবে, সেই এই জগতের মধ্যে তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, তোমার ন্যায় অভিমানিনী, বীরপুরুষ! তোমার উপযুক্ত বীরনারী।"

নরে। "মহাশয়, আপনার কথায় বিস্মিত হইলাম।"

শৈল। "আর একটী কথা আছে; এটী ভয়ানক কথা মন দিয়া শুন। এই স্বপ্ন দেখিয়া কাল প্রাতে তুমি এই গহ্বর হইতে বাহিরে যাইও। তিন দিন তোমাকে সময় দিলাম, স্বপ্নদৃষ্টা নারীকে বিবাহ করিবে কি না, তিন দিনের মধ্যে স্থির করিবে। যদি সম্মত হও, তবে তিন দিন পরে শ্বেত-চন্দনরেখা ললাটে ধারণ করিয়া অমাবস্যার সায়ংকালে আমার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিও, কিরূপে সে কন্যা পাইবে তাহার উপায় বলিয়া দিব। যদি এ বিবাহে না সম্মত হও, তবে রক্তচন্দনের রেখা ললাটে ধারণ করিয়া আমার সহিত ঐ অমাবস্যার সায়ংকালে এই স্থানে সাক্ষাৎ করিও; তোমার সমুচিত শাস্তি দিয়া নররক্তবিলাসিনী কালীকে পরিতুষ্টা করিব। ইহাতে প্রতিশ্রুত হও, নচেৎ কালী তোমাকে স্বপ্ন দিবেন না।" শৈবের স্বর স্থির ও গম্ভীর!

নরেন্দ্র চমকিত হইলেন; তথাপি ভয়ের চিহ্ন প্রদর্শন করিতে লজ্জিত হইলেন, স্থিরস্বরে কহিলেন, "প্রতিশ্রুত হইলাম; তিন দিন পর অমা-বস্যার সন্ধ্যায় আপনার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিব। ইহাতে যে প্রকার অঙ্গীকার করিতে বলেন করিতে প্রস্তুত আছি।" শৈলেশ্বর বলিলেন, "তুমি বীরপুরুষ; তোমার কথাই অঙ্গীকার; রজনী তিন প্রহর হইয়াছে; আমি বিদায় হইলাম।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বীণাহস্তে।

নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সেই অন্ধকার গহ্বরে বিচরণ করিতে লাগিলেন, একাকী বিদেশে ভীষণ স্থানে ভীষণ শৈবের হস্তে পতিত হইয়াছেন; বাল্যকালের ভালবাসা, যৌবনের প্রেম সহসা উৎপাটিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। না করিলে করালবদনা কালীর সম্মুখে জীবন সমর্পণ করিবেন। একাকী অনেকক্ষণ সেই গহ্বরে পদচারণ করিতে লাগিলেন। কি ভীষণ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহা আমরা অনুভব করিতে সাহস করি না।

অনেকক্ষণ পর অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় দেখিয়া তিনি শৈবের আদেশ স্মরণ করিলেন, কলসে যে মদিরা ছিল, সমস্ত পান করিলেন; মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অগ্নির একপার্শ্বে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন।

অগ্নি দেখিতে লাগিলেন, এক একবার কাষ্ঠের এক অংশ প্রদীপ্ত হয়, আবার নির্ব্বাণ হয়, এক একটী স্ফুলিঙ্গ দেখা যায় আবার অঙ্গার হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি প্রায় সমস্ত নির্ব্বাণ হইল, হীনতেজ আলোকে সেই শিলাগৃহের শিলাভিত্তি আরও অপরূপ দেখাইতে লাগিল; নরেন্দ্রনাথ উন্মত্তপ্রায়, তিনি সেই ভিত্তির উপর আলোক ও ছায়ার নৃত্যতে যেন অমানুষিক জীবের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন; কালীর নয়নদ্বয় যেন ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, কালীর হস্তের খড়্গ যেন নরেন্দ্রের দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্র উঠিবার চেষ্টা করিলেন, উঠিবার শক্তি নাই। কি ভয়ানক! নরেন্দ্র জাগ্রত না সুপ্ত?

অচিরাৎ শেষ অগ্নিকণা নির্ব্বাণ হইল। নরেন্দ্র তাহা দেখিতেছিলেন না, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এতক্ষণ দূরস্থ জলের শব্দ যাহা শুনা যাইতেছিল, নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন, সে সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনি হইল। গভীর অন্ধকারে যেন ক্রমে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইতে লাগিল; যে স্থানে গহ্বরের ভিত্তি ছিল তথায় যেন একটী প্রস্তর সহসা পড়িয়া যাইল, তাহার ভিতর হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি, অপূর্ব্ব সৌর আলোকের ন্যায় আলোক বাহির হইতে লাগিল। ক্রমে যেন সূর্য্যের উপর হইতে মেঘ সরিয়া গেল, সে আলোকস্থান সম্পূর্ণ মুক্ত হইল। উঃ! একি স্বপ্ন না যথার্থ? স্বর্গীয় আলোকে জ্বলন্ত রূপরাশিবিভূষিতা

এক জন ষোড়শী বীণাহস্তে উপবেশন করিয়া অপূর্ব্ব বাদ্য করিতেছে। নরেন্দ্র বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া সেই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

উঃ! কি অপরূপ সৌন্দর্য্য, কি উজ্জ্বল নয়ন, কি কৃষ্ণ কেশপাশ, কি ক্ষীণ অঙ্গ, এ কি মানবী? নরেন্দ্রনাথ ভাল করিয়া দেখ, এ বদনমণ্ডল, এ চারুনয়ন ও ওষ্ঠ কি তুমি কখনও দেখ নাই?

সুদূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় স্মৃতিশক্তি নরেন্দ্রের মনে ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হইল।

কাশীর যুদ্ধ, দিল্লী, দিল্লীতে অপ্সরাবিষয়ক স্বপ্ন, একজন মুসলমান নারী; উঃ! এ যে সেই "অভাগিনী জেলেখা!" তবে দিল্লীর সে অপ্সরার স্বপ্ন নহে, তবে সে যথার্থ নারীমণ্ডলী দেখিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে উৎকৃষ্ট কুসুমটী আজি রাজস্থানের পর্ব্বতগহ্বরে ফুটিয়াছে, না কি সেও স্বপ্ন, এও স্বপ্ন? স্বপ্নে যে অপ্সরা একবার দিল্লীতে দেখা দিয়াছিল, আজিও সেই রাজস্থানে দেখা দিল। অপ্সরা কি মনুষ্যের প্রেমাকাঙ্ক্ষী? শৈলেশ্বর না মানবীর প্রেমের কথা বলিয়াছিলেন?

নরেন্দ্রের চিন্তা করিবার সময় ছিল না, সহসা সপ্তস্বরসমন্বিত অপ্সরা-কণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব্ব গীত সেই পর্ব্বতকন্দর আমোদিত করিল; নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত করিল। জেলেখা সেই বীণার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব মিষ্ট গান সংযোজনা করিয়াছেন; আহা! কি মধুর, কি হৃদয়গ্রাহী, কি ভাব-পরিপূর্ণ। নরেন্দ্র একদৃষ্টিতে সেই জেলেখার দিকে চাহিয়া রহিলেন; গাইতে গাইতে জেলেখার কণ্ঠ এক একবার রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া দুই এক বিন্দু জল গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

পতির জন্য পতিব্রতা কি সাধিতে পারে, জেলেখা তাহাই গাইতে লাগিল। হৃদয়ে হৃদয় স্থাপন করিয়া, নয়নে নয়ন স্থাপন করিয়া, অজস্র প্রেমবারিদানে প্রেমতৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে। গৌরবকালে, সম্পদ্‌কালে, প্রেমালোক দ্বিগুণ জ্বালিয়া লক্ষ্মীরূপিণী পতির আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে। ভীষণ রণের মাঝে বীর্য্যবতী প্রদীপ্ত আশারূপিণী হইয়া পতির হৃদয় বীররসে পরিপূর্ণ করিতে পারে। যবে দুঃখ-অন্ধকারে জীবনের আশাপ্রদীপ একে একে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, দুঃখীর সমদুঃখিনী তখন একাকিনী স্বামীর সেবা ও ক্লেশবিমোচন করিতে পারে। অবশেষে জীব-আকাশ হইতে জীবতারা যবে খসিয়া যায়, পতিব্রতা নারী উল্লাসে প্রিয়ের পাশে সহমৃতা হইতে পারে।

এই মর্ম্মের সুন্দর গান সমাপ্ত হইল, কিন্তু নরেন্দ্রের কর্ণমূলে তখনও সে সঙ্গীত শেষ হইল না। এক একবার সুমধুর ধীরশব্দে, এক একবার বজ্রনাদে

তাঁহার কর্ণে সে গান এখনও শব্দিত হইতে লাগিল। জেলেখা মানবী কি পরী-কন্যা? যেই হউক, নরেন্দ্র তাহার মুখমণ্ডল বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; বোধ হইল, যেন পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলেন এখন সেরূপ নাই, তাহা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী কিম্বা অল্প সুন্দরী হইয়াছেন, নরেন্দ্র তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। শোকের পাণ্ডুবর্ণ ললাটে ন্যস্ত হইয়াছে; বাহু ও অঙ্গুলী অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, নয়নদ্বয়ে যেন দুঃখ নিবাস করিতেছে। নরেন্দ্র আর দেখিবার সময় পাইলেন না; আবার অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি পর্ব্বতকন্দর কাঁপাইতে লাগিল; আবার দুঃখের গানে নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত ও দ্রবীভূত হইল।

পতির নিকট পতিব্রতা নারী কি ভিক্ষা চাহে, জেলেখা এবার তাহাই গাইতে লাগিল। প্রেমভিক্ষা ভিন্ন এ জগতে দাসীর আর কি ভিক্ষা আছে? প্রেমলতিকার বেশে তোমার পদযুগল ধরিয়াছে, স্নেহকণা দিয়া সজীব করিও, যেন ধরণীতে না লোটায়। জ্ঞাতি, বন্ধু, দেশ দূরে রাখিয়া তোমার নিকট আসিয়াছে, জীবনের এই আশা, যে তোমার সুখে সুখিনী হইবে, তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইবে। আহা! তোমার পদচ্ছায়া যেন পায়। যতদিন প্রাণ থাকে ইহা ভিন্ন ভিক্ষা নাই, আয়ুঃ শেষ হইলে পতির চরণ ধরিয়া পতির মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা ভিন্ন সতীর আর কি ভিক্ষা আছে?

গান সমাপ্ত হইল; আহা! নয়নজলে সে পাণ্ডুবদনখানি ও উরঃস্থল ধৌত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে মেঘচ্ছায়ায় যেন সূর্য্যকান্তি আচ্ছন্ন হইল; আলোকদ্বার ক্রমে রুদ্ধ হইল; সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি ঢাকিয়া গেল; গভীর অন্ধকারে বীণাধ্বনি আবার থামিয়া গেল; পূর্ব্বশ্রুত দূর-জলশব্দ ভিন্ন নরেন্দ্র আর কিছু শুনিতে পাইলেন না। নরেন্দ্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; আর কি স্বপ্ন দেখিলেন প্রাতে তাহা মনে রহিল না। নিদ্রান্তে নরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার মত্ততা আর নাই, তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে গাত্রোত্থান করিলেন। গহ্বর হইতে খড়্গ লইয়া বাহিরে আসিলেন; দেখিলেন, নবজাত সূর্য্যরশ্মিতে বৃষ্টিস্নাত বৃক্ষলতা ও দূর্ব্বাদল ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, ডালে ডালে পক্ষিগণ গান করিতেছে, সুদূরে একলিঙ্গের প্রকাণ্ড শ্বেত-প্রস্তরবিনির্ম্মিত মন্দির সূর্য্যকিরণে বড় শোভা পাইয়াছে। মন্দির লোকসমাকীর্ণ, আর চতুর্দ্দিকে বহুদূরে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত সূর্য্য-রশ্মিতে সুন্দর দেখা যাইতেছে!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

খড়্গাহস্তে।

সেই তিন দিন নরেন্দ্রনাথ কি চিন্তাজালে বেষ্টিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। শত সহস্র চিন্তা নরেন্দ্রনাথকে শত বৃশ্চিক-দংশনাপেক্ষা অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল। নরেন্দ্র সে যাতনায় অস্থির হইলেন।

সেই ভীষণ পর্ব্বত-গহ্বরে শৈলেশ্বর যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নরেন্দ্রের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল না। হেমলতা পরের স্ত্রী, পরের গৃহিণী, তাহার চিন্তা, তাহার প্রতি ভালবাসা কি উচিত কার্য্য? নরেন্দ্রনাথ, তুমি যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় দাও, এই কি বীরের উপযুক্ত কার্য্য? শৈবের উন্নত আদেশ গ্রহণ কর, অসি-হস্তে প্রেমচিন্তা উৎপাটন কর, যশের পথ পরিষ্কার কর, দেশের গৌরব সাধন কর, ইহা অপেক্ষা বীরের উপযুক্ত কার্য্য আর কি আছে? নরেন্দ্রের বীরহৃদয় স্ফীত হইল, তিনি স্থির করিলেন শৈবের আদেশ শিরোধার্য্য।

আবার তিন বৎসর পর বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একাকী নক্ষত্রের আলোকে যে পাণ্ডুবর্ণ শুষ্ক মুখখানি দেখিয়াছিলেন, গঙ্গাতীরে যে ক্ষীণ শরীর আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই দুঃখিনী হেমলতার কথা মনে পড়িল। উঃ! এ ভাব কি মনুষ্য দমন করিতে পারে? নরেন্দ্রের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সেই হেম বাল্যকালে নরেনের সহিত খেলা করিয়াছে, যে দিন নরেন গৃহত্যাগী হয় হেম সে দিন নদীতীরে একাকী অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল, যেন আপন জীবনকে বিদায় দিতেছিল, তাহা নরেনের মনে পড়িল। বাল্যকালে হেম নরেন ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না; যৌবনের প্রারম্ভে দিনান্তে নরেনের মুখ দেখিলে যেন হেম উদ্বেগশূন্য ও শান্ত হইত। বাল্যকালে একদিন নরেন হেমকে একখানি সামান্য কাচের কণ্ঠমালা সযত্নে পরাইয়া দিয়াছিল, হেম সে অবধি স্বর্ণমালা রত্নমালা তুচ্ছ করিয়া সেই মালা হৃদয়ে ধারণ করিত। আর একদিন নরেন্দ্র হেমকে না বলিয়া নৌকারোহণে নিকটস্থ একটী গ্রামে গিয়াছিল। সায়ংকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, বালিকা সেদিন পাঠ দিতে পারে নাই, ভাল আহার করিতে পারে নাই, নিজ কক্ষে বসিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া একাকী চিন্তা করি-

তেছে। আর একদিন পিতাকে না বলিয়া হেম নরেনের সহিত "ও-পারে" গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিলে নবকুমার হেমকে যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার করিয়াছিল; তথাপি হেম নরেনের দোষ দেয় নাই, নরেন তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, সে কথা প্রকাশ করে নাই। এইরূপ পূর্ব্বকালের, বাল্যকালের সহস্র কথা অজস্র বারিতরঙ্গের ন্যায় নরেন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত ও আলোড়িত করিতে লাগিল; নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না; একাকী মন্দির-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

আবার চিন্তা আসিতে লাগিল। নরেন্দ্রের দেশ নাই, গৃহ নাই, বন্ধু নাই, পরিজন নাই, নরেন্দ্র একাকী দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কেবল হেমের চিন্তাস্বরূপ নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সংসার-সমুদ্রে বিচরণ করিতেছেন! নিদারুণ শৈব! অভাগার একমাত্র সুখচিন্তা, এক-মাত্র সুখস্বপ্ন দূর করিও না; এ নিদারুণ আদেশ করিও না। নরেন্দ্র অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছে; আরও যে ক্লেশ আদেশ কর সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে; নরেন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে, বীরমর্য্যাদা ত্যাগ করিবে, পীড়াকষ্ট অন্নকষ্ট ভোগ করিতে সম্মত আছে, জগতের নিন্দা-ভার বহন করিতে সম্মত আছে, অথবা জগৎ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র আদি ভীষণ জন্তুর সহিত ঘোর অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করিতে সম্মত আছে। শৈলেশ্বর! আদেশ কর, ইহাতে যদি ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, নরেন্দ্র তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিবে; ইহাতে যদি নরেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কোচ করে, করালবদনার সম্মুখে তাঁহার মস্তক-চ্ছেদন করিও; কিন্তু বাল্যকাল অবধি যে চিন্তা অবলম্বন করিয়া নরেন্দ্র জীবনধারণ করিতেছে, যৌবনে যে আনন্দের ভাব আলোক-হিল্লোলের ন্যায় নরেন্দ্রের হৃদয়ে নৃত্য করিত; সুখের চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়াও যে আলোকস্তম্ভস্বরূপ মূর্ত্তির চিন্তায় নরেন্দ্র দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছে; নিদারুণ শৈব! সে চিন্তা দূর করিতে বলিও না। নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না; আবার নিঃশব্দে দর-বিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিলেন। এখন হেম পরের গৃহিণী, তথাপি নরেনের ভালবাসা বিস্মরণ হয় নাই, নরেনের চিন্তায় সে সুন্দর মুখখানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র তাহার চিন্তা ত্যাগ করিবে? নরেন্দ্র মুসলমান হইয়া যবনীকে বিবাহ করিবে? হেম তাহা শুনিবে? সে ভাবনা অসহ্য। নরেন্দ্র স্ত্রীলোকের ন্যায় যাবজ্জীবন রোদন করিবে, নরেন্দ্র

বীর নহে, বীর হইতে চাহে না। দেশের উন্নতি! জাতির উন্নতি! মুসলমান হইয়া খ্যাতি লাভ করিলে মুসলমান-রাজ্যের মুসলমান-সমাজের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, দেশের, স্বজাতির কি হইল? প্রবঞ্চক শৈব! তোমার উপদেশ প্রবঞ্চনা মাত্র, নরেন্দ্র গ্রাহ্য করিবে না। হিন্দু পুরোহিত হইয়া তুমি যবনীর পাণিগ্রহণ করিতে উপদেশ দেও। বিধর্ম্মি! কপটাচারি! দূর হও।

আবার শৈলেশ্বরের গম্ভীর আদেশ মনে পড়িল।

"হা নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, জগৎকে ভুলাইও না, যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর।" শৈব কি মিথ্যাবাদী? পরনারী-চিন্তা কি পাপ নহে? নরেন্দ্রনাথ, সাবধান! আপনি পাপে লিপ্ত হইতেছ, শৈব প্রকৃত বন্ধু, তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছেন, তাহার নিন্দা করিও না।—নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া ভাবিয়া সে দিন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তিন দিন অতিবাহিত হইল, তৃতীয় দিবস রজনীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই দণ্ড পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ সেই গহ্বরমুখে একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এক একবার এদিক্ ওদিক্ নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করিতেছেন, এক একবার অন্ধকার আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টি করিতেছেন, আবার গহ্বরমুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন। হস্তে নিষ্কোষিত অসি; আকৃতি স্থির ও গম্ভীর!

ক্ষণেক পর শৈলেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নরেন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; নরেন্দ্রনাথ পুরোহিতকে প্রণাম করিতে বিস্মৃত হইলেন।

শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছ?" গম্ভীর ও ঈষৎ কর্কশ স্বরে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হইয়াছি।" উভয়ে গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

গহ্বরে পূর্ব্বদিনের ন্যায় অতি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোকচ্ছটায় শৈলেশ্বর যাহা দেখিলেন তাহাতে চমকিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের ললাট, গণ্ডস্থল, স্কন্ধ, বাহু, বক্ষঃস্থল রক্তচন্দনে একেবারে প্লাবিত রহিয়াছে!

শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—

"পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রী-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারিলে না?"

নরেন্দ্র। "পরস্ত্রী-আকাঙ্ক্ষা রাখি না।"

শৈলে। "হেমলতাকে এ জীবনে আর দেখিতে চাহ না?"

নরে। "তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।"

শৈলে। "তবে যবনীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছ ?"

নরে। "এ জীবনে নহে।"

শৈলেশ্বর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিলেন—

"তবে প্রতিজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হও। খড়্গ ত্যাগ কর; কালীর সম্মুখে জীবন দানে প্রস্তুত হও।"

নরে। "আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা পালন করিয়াছি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়াছিলাম।"

শৈলে। "মূঢ়! সিংহের গহ্বরে আসিয়াও জীবনের প্রত্যাশা আছে ? এই দণ্ডে তোর প্রাণনাশ করিব; এস্থলে তোর কে সহায় ?"

নরে। "এই অসি আমার সহায়।" আলোকচ্ছটায় অসি ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল।

শৈলেশ্বর নিঃশব্দে গহ্বরের এক স্থান হইতে আপন অসি বাহির করিলেন। উদয়পুরে একবার যেরূপ হইয়াছিল অদ্য আবার দুইজনে অসিযুদ্ধ হইল। নরেন্দ্র সেদিন অপেক্ষা অধিক সাবধানে অধিক যত্নে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে যত্ন বৃথা! সিংহবীর্য্য শৈব অল্পক্ষণ মধ্যেই নরেন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অসি কাড়িয়া লইলেন; ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—

"কেবল পূজা ব বসায়ে এই কেশ শুক্ল হয় নাই। রাজস্থানভূমি বীরপ্রসবিনী, কিন্তু যুদ্ধকালে শৈব গোস্বামিগণ বীর্য্যপ্রকাশে রাজস্থানেও অগ্রগণ্য। বালক! বঙ্গদেশবাসি! তোর সহিত যুদ্ধ করিলাম এই কলঙ্ক আমার রহিল।"

নরেন্দ্র স্থিরস্বরে বলিলেন—"আমি ইহার জন্যও প্রস্তুত আছি; তোমার যাহা ইচ্ছা, যাহা সাধ্য কর।"

শৈলেশ্বর একটী রজ্জু বাহির করিলেন; নরেন্দ্রের দুই হস্ত সেই রজ্জুদ্বারা সজোরে বন্ধন করিলেন, এরূপ জোরে বাঁধিলেন যে হস্তের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল; নরেন্দ্র শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেন না। পরে পূর্ব্বের ন্যায় কলস লইয়া নরেন্দ্রের মুখের নিকট ধরিয়া মদ্যপান করিতে বলিলেন; নরেন্দ্র তাহাই করিলেন। গোস্বামী গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মত্ততাহেতু নরেন্দ্র অচিরাৎ ভূমিতে নিপতিত হইলেন, চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, গহ্বর-পার্শ্বে দুই জন যেন ধীরে ধীরে কথা কহিতেছে এইরূপ নরেন্দ্রের বোধ হইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্র মদিরাপ্রভাবে নিদ্রায় পতিত হইলেন, আর কি হইল স্মরণ রহিল না।

কিন্তু সে নিদ্রা গভীর নহে; নরেন্দ্র সমস্ত রজনী স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, কখন স্বপ্ন দেখেন, কখন অর্দ্ধেক জাগ্রত হইয়া থাকেন। কখন্ স্বপ্ন দেখেন, কখন্ জাগ্রত থাকেন, মত্ততাপ্রযুক্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পর বোধ হইল, যেন পূর্ব্বে এক দিনের ন্যায় আবার অন্ধকারে আলোকচ্ছটা প্রকাশ হইতে লাগিল, আবার যেন প্রস্তরভিত্তি সরিয়া গেল, মেঘ সরিয়া গেলে যেন সূর্য্যালোক প্রকাশ হইল। সেই আলোকে সেই উজ্জ্বল রমণী! কিন্তু জেলেখা অদ্য গান গাইতেছে না, অদ্য বীণাহস্তে আইসে নাই, অদ্য খড়্গাহস্তে!

উঃ! এ কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ওষ্ঠের উপর দন্ত চাপিয়া রহিয়াছে, সমস্ত বদনমণ্ডল ক্রোধপ্রজ্জ্বলিত ও রক্তবর্ণ; বামার করে সেই শৈবের দীর্ঘ খড়্গ, বামার বক্ষে একটী তীক্ষ্ণ ছুরিকা! নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন; তাঁহার ললাট হইতে স্বেদ বহির্গত হইতে লাগিল; তিনি উঠিবার উদ্যম করিলেন; কিন্তু স্বপ্নে বিপদাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় পলাইতে অক্ষম, উঠিতে অক্ষম।

বামা মৃণাল-করে দীর্ঘখড়্গ ধারণ করিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। একবার দণ্ডায়মান হইলেন, একবার নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন; হস্ত হইতে সে খড়্গ পড়িয়া গেল, জেলেখা নম্রশিরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা ধারণ করিলেন; এবার দৃঢ়হস্তে সে ছুরিকা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থলের উপর ধরিলেন। আবার কি চিন্তা আসিল; ছুরিকা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইল, বামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

নরেন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিলেন; তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, দেখিলেন ঘর্ম্মে তাঁহার সমস্ত শরীর আপ্লুত হইয়াছে; উন্মত্ততা গিয়াছে; গহ্বর অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে তিনি গহ্বরের বাহিরে আসিলেন। রজনী অবসানপ্রায়; পূর্ব্বদিকে রক্তিমা ছটায় আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে; নির্ব্বাণপ্রায় প্রদীপের ন্যায় দুই একটী তারা এখনও দেখা যাইতেছে; প্রত্যূষের শীতল বায়ু সেই পর্ব্বতশ্রেণী ও শিব-মন্দিরের উপর বহিয়া যাইতেছে ও নবজাত পুষ্পপরিমল বহিয়া নিদ্রোত্থিত জগৎকে আমোদিত করিতেছে। দুই একটী নিকুঞ্জ বনঁ হইতে দুই একটী পক্ষী সুন্দর গীত করিতেছে। নরেন্দ্র শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাদলের উপর দিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামনগরের যুদ্ধ।

উপরি উক্ত ঘটনার কিছু পর যোধপুরাধিপতি রাজা যশোবন্তসিংহ পুনরায় সৈন্য সামন্ত লইয়া আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করণাভিলাষে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথও সেই সৈন্যের সহিত রাজস্থান ত্যাগ করিলেন। যে কয়েক মাস নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে ছিলেন তাহার মধ্যে আগ্রায় একটী রাজবিপ্লব ঘটিয়াছিল; আগ্রায় এক্ষণে সে সম্রাট্ নাই, সে রাজত্ব নাই। সে বিপ্লবের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক; ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এ পরিচ্ছেদ ছাড়িয়া যাইতে পারেন।

এই ভীষণ ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া অবধি প্রথমে বারাণসীতে সুলতান-সুজা ও তৎপরে উজ্জয়িনীতে যশোবন্তসিংহ পরাস্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই শেষ ঘটনার বিষয় শুনিয়া সম্রাট্ শাজিহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক লক্ষের অধিক সেনা লইয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন ও চম্বল নদীতীরে শিবির অধিবেশন করিয়া মোরাদ ও আরংজীবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাঁহারা ঐ নদীর অপর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোরাদ যেরূপ সাহসী সেইরূপ যুদ্ধকৌশলে অবিজ্ঞ, নদী পার হইয়া সংগ্রাম করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কৌশলপটু আরংজীব তাহা না করিয়া দারাকে ভুলাইবার জন্য শিবির সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া গোপনে সৈন্যশুদ্ধ নদীর অপর এক স্থান পার হইলেন ও আগ্রা হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে শ্যামনগর নামক গ্রামে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। শত্রু চম্বল পার হইয়াছে ও আগ্রার নিকট যমুনাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে শুনিয়া দারা একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, ও তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্য লইয়া সেই গ্রামের নিকট যমুনাতীরে আপন শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

শ্যামনগরের যুদ্ধের ফল ভারতবর্ষের সিংহাসন। উভয় পক্ষই এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন; চারি দিবসকাল উভয় সৈন্য উভয়ের সম্মুখীন হইয়া রহিল; পঞ্চম দিবসে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধের বর্ণনায় আমাদিগের আবশ্যক নাই। দারার বামপার্শ্বে রাজপুত রাজা রামসিংহ ও চত্রশাল পুরুষোচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিহত হইলেন;

দারার দক্ষিণ দিকে কালীউল্লা নামক মুসলমান সেনাপতি বিদ্রোহী আরংজীবের অর্থভুক্, যুদ্ধে লিপ্ত হইল না। অবশেষে আরংজীবের জয় হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশলপটু আরংজীব কালীউল্লার সম্মান করিলেন ও মোরাদকে ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন।

দারার পুত্র সুলাইমান বারাণসীর যুদ্ধে সুজাকে পরাস্ত করিয়া আসিয়া পিতার পরাজয়ের কথা শুনিলেন; তৎক্ষণাৎ সপরিবারে কাশ্মীর দেশে পলায়ন করিলেন। অচিরাৎ আরংজীব ছলে, বলে, কৌশলে আগ্রা হস্তগত করিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন। শাজিহানের দুই কন্যার মধ্যে রৌশন্ আরা সকল বিষয়ে আরংজীবকে সমাচার প্রদান করিয়া তাঁহার অনেক সহায়তা করিতেন। অন্য কন্যা জেহান আরা রূপে, গুণে, কৌশলে রৌশন্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; তিনি সম্রাটের অধিকতর প্রিয়া ও দারার হিতসাধনে সযত্না ছিলেন; কিন্তু আরংজীবের বুদ্ধিকৌশলে সকলেই পরাস্ত হইলেন।

আগ্রা হস্তগত করিয়া আরংজীব দিল্লী যাত্রা করিলেন। পথে মথুরাতে মোরাদকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মোরাদ মদিরাপানে ও সুন্দরী গায়কী ও নর্ত্তকীগণের সৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া পড়িলেন। মোরাদকে মধ্যে করিয়া সেই জগদ্বিমোহিনিগণ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বসিল; মোরাদ অচিরাৎ একেবারে প্রমত্ত হইয়া একজন সুন্দরীর আলিঙ্গনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। আরংজীবের তাহাই উদ্দেশ্য, মোরাদ সেই রজনীতেই কারারুদ্ধ হইলেন।

তাহার পর? তাহার পর আরংজীব রাজছত্র আপন মস্তকের উপর ধারণ করিলেন। দারা সিন্ধুনদীর দিকে পলায়ন করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে সুলতানসুজা পুনরায় সৈন্য লইয়া যুদ্ধবেশে বহির্গত হইলেন; রাজস্থানে যশোবন্তসিংহ পরাজয়ের অপমান এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনিও সসৈন্যে বহির্গত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

আগ্রা।

কয়েকদিন ভ্রমণানন্তর যশোবন্তসিংহের সেনা আগ্রা নগরে উপনীত হইল। আরংজীবের পরাক্রম অসীম, তাঁহার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করা

যশোবন্তের সাধ্য নহে; তিনি সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আরংজীবের মিত্রবেশে পরমশত্রু আগ্রা নগরে প্রবেশ করিলেন।

যমুনার অনন্ত সৌন্দর্য্য ও আগ্রা নগরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া কে না বিমোহিত হইয়াছে? সুদূরে শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত, অপূর্ব্ব চারু শিল্প-খচিত, সূর্য্যরশ্মি-প্রতিঘাতী জগতে অতুল্য তাজমহল নীল গগনে প্রতিকৃতির ন্যায় বোধ হয়। তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর পথ, সুন্দর কুঞ্জবন, সুন্দর ফোয়ারা;—পার্শ্বে শ্যামা যমুনা। আগ্রার প্রকাণ্ড দুর্গ; তন্মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর মতি মস্‌জীদ্, দেওয়ান খাস, দেওয়ান আম, রংমহল, শীশমহল। আগ্রার সৌন্দর্য্য কত বর্ণনা করিব! পাঠিকাগণ! যদি এই অপূর্ব্ব নগরী না দেখিয়া থাক, অদ্যই যাইবার উদ্যোগ কর। তোমাদের "তিনি" ব্যয়ের ওজর করিবেন, তাহা শুনিও না, তোমরা অনুরোধ করিলে কি নিষ্ফল হয়? যে অব্যর্থ মন্ত্র পাতিয়া স্বামীর সর্ব্বস্ব ক্ষয় করিয়া রাশি রাশি গহনা করিয়াছ একবার সেই মন্ত্র পাত, অবশ্য আগ্রা দর্শন হইবে!

প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসনে অদ্য সম্রাট্ আরংজীব উপবেশন করিয়াছেন। প্রাসাদের শ্বেত স্তম্ভসারি রক্তবর্ণ সাটিনে মণ্ডিত রহিয়াছে। রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ হইতে পুষ্পমাল্যের সহিত মণিমাণিক্য ঝুলিতেছে ও বালসূর্য্য-করস্পর্শে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; চারিদিকে মহারাজা, রাজা, ওমরাহ, মনসবদার প্রভৃতি ভারতের অগ্রগণ্য বীর ও ধনী ও মান্য লোকে নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া অদ্য রাজপ্রাসাদকে ইন্দ্রপুরী করিয়াছে!

সেই প্রাসাদের সম্মুখে একটী বিস্তৃত শিবির সন্নিবেশিত ছিল, শিবিরের চতুর্দ্দিকে রৌপ্য-বিনির্ম্মিত স্তম্ভ ঝক্‌মক্ করিতেছে। উপরের বস্ত্র উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; ভিতরে মসলীপত্তনের ছিট্। সে ছিটে লতা পুষ্প এরূপ সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে, যে দর্শকগণ শিবিরের পার্শ্বে যথার্থ পুষ্প ফুটিয়াছে না ভাবিয়া থাকিতে পারেন না। ভূমিতে সেইরূপ অপরূপ গালিচা, তাহাতেও পুষ্পগুলি এরূপ সুন্দরভাবে বুনা হইয়াছে, যে শিবিরস্থ ব্যক্তি পুষ্প দলিত হইবে ভয়ে সহসা পদক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ করেন।

তাহার বাহিরে দুর্গের প্রাচীর পর্য্যন্ত জয়পতাকা, তোরণ, ও পুষ্পমাল্য দ্বারা দুর্গ সুশোভিত হইয়াছে; সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিজয়-বাদ্যে সকলের মন উত্তেজিত করিতেছে, নবজাত সূর্য্যরশ্মিতে তাহাদের বন্দুক ঝকমক্ করিতেছে; সুদূরে দুর্গপ্রাচীরের উপর ইংরাজ ও ফরাশিশ

ও ওলন্দাজ, সৈনিক ঘন ঘন কামান ছাড়িতেছে, বহুদূর হইতে রত্নগর্ভ ভারতবর্ষে রত্ন কুড়াইবার জন্য আসিয়াছে ও সম্রাটের বেতনভোগী হইয়া অদ্য কামানের শব্দে সম্রাটের বিজয় প্রচার করিতেছে। দুর্গের বাহিরে নগরের ভিতরে ও চারিদিকে পথে, ঘাটে, গৃহে, দ্বারে, যমুনাতীরে রাশি রাশি লোক নিজ নিজ সুপরিচ্ছদে দলবদ্ধ হইয়া প্রশস্ত আগ্রা নগর ও যমুনাতীর পরিপূর্ণ করিয়াছে।

পুরাতন রীত্যনুসারে আরংজীব সুবর্ণের সহিত ওজন হইলেন, তাহার পর প্রধান প্রধান ওমরাহগণ ঐরূপে ওজন হইলেন; প্রত্যেক ওমরাহ, রাজা ও মনসবদার সুবর্ণ, মুক্তা ও হীরক নজর দিয়া সম্রাটের মনস্তুষ্টি করিলেন।

তাহার পর জগদ্বিমোহিনী কঞ্চনীগণ প্রৌঢ় যৌবন-মদে উন্মত্ত হইয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত ও নৃত্যদ্বারা সভাসদ্‌গণের হৃদয় বিমোহিত করিল। কঞ্চনীগণ সাধারণ বারবণিতা নহে; তাহারা নর্ত্তকী, বড় বড় ওমরাহ-দিগের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হইলে তাহারা সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে যাইত। শাজিহান তাহাদের সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতে ভাল বাসিতেন ও বেগমদিগের আলয়েও লইয়া যাইতেন; কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ-পরাঙ্মুখ আরংজীব তাহাদের প্রায় নিকটে আসিতে দিতেন না, তবে আনন্দের দিনে কঞ্চনীগণ কেননা সমাদৃত হইবে।

তাহার পর দুর্গের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ যমুনাতীরে মল্লযুদ্ধ অসিযুদ্ধ প্রভৃতি নানারূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল; প্রাসাদের উপর হইতে বেগমগণ দেখিতে পাইবেন এই জন্য এই স্থলে যুদ্ধ হইত। অবশেষে দুই মত্ত হস্তীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মধ্যে আন্দাজ দুই হাত উচ্চ একটী মৃত্তিকার প্রাচীর, তাহার দুই দিক্ হইতে দুইটী মত্তহস্তী মাহুত দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভীষণ রণে লিপ্ত হইল। অনেকক্ষণ যমুনার উভয়পার্শ্ব হইতে লোক সবিস্ময়ে এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল, শুণ্ডের চপেটাঘাতে ও দন্তজনিত আঘাতে হস্তিদ্বয়ের মস্তক ও শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইল। প্রত্যেক হস্তীর দুইজন করিয়া মাহুত ছিল; একটী হস্তীর একজন মাহুত পড়িয়া গেল ও সহসা হস্তী দ্বারা পদদলিত হইয়া জীবনত্যাগ করিল, অপর পক্ষের একজন মাহুতের ঐরূপে জন্মের মত হাত ভাঙ্গিয়া গেল। হতভাগারা এই জীবনের আশায় নৈরাশ হইয়াই হস্তীদ্বয়কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, বহু অর্থলোভে স্ত্রী পুত্র সকলের নিকট পূর্ব্বে বিদায় লইয়াই আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর একটী হস্তী অন্যকে পরাস্ত করিয়া মৃত্তিকাপ্রাচীর

উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরের পশ্চাৎ ধাবমান হইল; তাহাদের ছাড়াইবার জন্য অনেকে চরকী প্রভৃতি আগুনের বাজী করিল, কিন্তু সঞ্জাতক্রোধ হস্তী তাহাতে নিরস্ত না হইয়া অপর হস্তীর পশ্চাৎ ধাবমান হইল; অবশেষে পরাজিত হস্তী সন্তরণ করিয়া যমুনা পার হইয়া গেল, পথিমধ্যে দুই এক জন লোক যাহারা সম্মুখে পড়িল তাহারাও নিহত হইল।

এ সমস্ত বালকোচিত ও নৃশংস আমোদ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া যমুনাপুলীনে যাইলেন ও মুখ ও হস্ত প্রক্ষালন করিয়া একটী সুন্দর বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন। যেস্থানে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন সেটী অতি মনোহর। বিশাল তমাল বৃক্ষ সূর্য্যের কিরণ নিবারণ করিতেছে ও বৃক্ষের উপর হইতে দুই একটী পক্ষী যেন দিনের তাপে ক্লিষ্ট হইয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিতেছে। নিকটে বৃক্ষের একপার্শ্বে একটী পুরাতন কবর আছে, প্রস্তর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ লতাদি সেই কবরের উপর জন্মিয়াছে। কবরের এক পার্শ্বে পারস্যভাষায় একটী বায়েৎ লেখা আছে তাহার অর্থ, "বন্ধু! আমার নাম জানিবার আবশ্যক কি? আমি জগতে অভাগা, অসুখী ছিলাম, তুমি যদি হতভাগা হও আমার জন্য একবিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিও।" মন্দ মন্দ যমুনা-বায়ু সেই শীতল স্থানকে আরও সুশীতল করিতেছে; কল্লোলিনী যমুনা সুমধুর কল কল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্রনাথ অচিরাৎ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

কতক্ষণ নিদ্রিত রহিলেন, তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। নিদ্রায় একটী অপরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। বোধ হইল যেন সেই অপূর্ব্ব গোরস্থান হইতে মৃত মনুষ্য পুনর্জ্জীবিত হইল,—সে একটী মুসলমান স্ত্রীলোক! মৃত্যুর ভীষণ শ্বেতবর্ণ স্ত্রীলোকের মুখে এখনও দেদীপ্যমান্। স্ত্রীলোকের চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, শরীর ক্ষীণ, সমস্ত অবয়ব দুঃখব্যঞ্জক। গোরস্থানে যে বায়েৎটী লেখা ছিল স্ত্রীলোক যেন সেই বায়েৎটী গান করিল, সে দুঃখ-ব্যঞ্জক গীতধ্বনিতে নরেন্দ্রের মুদিত নেত্র হইতে একবিন্দু জল ভূতলে পতিত হইল। মুসলমানী যেন সহসা আর একটী গীত আরম্ভ করিল,—একি? নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন সে স্বর অপরিচিত নহে; বোধ হইল যেন সে স্বর সেই অভাগিনী জেলেখা কণ্ঠ-নিঃসৃত, নরেন্দ্র ভাল করিয়া দেখ! একি? স্বয়ং জেলেখা গোরের উপর বসিয়া এই দুঃখগান গাইতেছে?

নরেন্দ্রের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ললাটে একটী উজ্জ্বল তারা বড় শোভা

পাইতেছে, সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া মৃদু গান করিতেছে, যমুনার নীল জল অধিকতর নীলবর্ণ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। এই জেলেখার গান তিনি নিদ্রাযোগে ইতিপূর্ব্বে তিন চারিবার শ্রবণ করিয়াছেন। জেলেখার প্রতি কি নরেন্দ্রের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে? নরেন্দ্র হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, হৃদয় হেমলতাময়! জেলেখা কি মানবী নহে, জেলেখা কি পরী, তবে মানবের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী কেন? নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে সেই গোরস্থানের দিকে আসিলেন, সহসা তিনি একেবারে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন; গোরের পার্শ্ব হইতে স্বয়ং জেলেখা দণ্ডায়মান হইলেন; তাহার ক্ষীণ শরীর ও পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন যথার্থই কবর-গহ্বরস্থ মৃতদেহ পুনর্জ্জীবিত হইল। বদন পাণ্ডুবর্ণ বটে, কিন্তু নয়ন হইতে পূর্ব্ববৎ তীক্ষ্ণ জ্যোতি বাহির হইতেছে, অবয়ব সেইরূপ তেজঃপরিপূর্ণ; তীক্ষ্ণজ্যোতির্ম্ময়ী বামা সরোষে অধর দংশন করিয়া নরেন্দ্রের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে; বক্ষঃস্থলে একটী তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্র-ভাগ দেখা যাইতেছে! এই নারী কি দুঃখগান গাইয়াছিল? বোধ হয় না।

জেলেখা নরেন্দ্রকে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া আপনি অগ্রে চলিল। অনেক দূর যাইয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজপ্রাসাদের একটী অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র এতক্ষণ ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন এক্ষণে গৃহের ভিতর অন্ধকারে রমণীর বিকটমূর্ত্তি ও বক্ষে ছুরিকা দর্শন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে জানি না, আমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাই নাই।"

জেলেখা। "আমার প্রাসাদে যাইবার অধিকার না থাকিলে তোমাকে আসিতে বলিতাম না।"

নরে। "তথাপি তুমি কে জানি না তোমার সঙ্গে যাইব না।"

জেলেখা কর্কশ স্বরে বলিল, "মৃত্যুভয় করিতেছ? তোমাকে হনন করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমি তাতারদেশীয়া, আমি এই ছুরিকা এতক্ষণ ব্যবহার করিতে পারিতাম না? এখনও এই বন্দুক ব্যবহার করিতে পারি না?" পরিচ্ছদের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র বন্দুক বাহির করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ের দিকে ধারণ করিয়া বলিল, "এ বন্দুক প্রস্তুত আছে আমার একটী অঙ্গুলী ব্যবহার করিলে তোমার জীবননাশ নিশ্চয়! কিন্তু এই লও, ছুরিকা ত্যাগ করিলাম, বন্দুক ত্যাগ করিলাম, রিক্তহস্তা স্ত্রীলোকের

সহিত যাইতে বোধ হয় বঙ্গদেশীয় বীরপুরুষেরও কোন আপত্তি নাই।” জেলেখার বিকট হাস্যধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল, ক্রোধে নরেন্দ্রের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল। তিনি নিঃশব্দে জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্ষণেক যাইলে পর জেলেখা এক স্থানে কতকগুলি বস্ত্র দেখাইয়া কহিল, “এইগুলি পরিধান কর।” নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিল সে তাতারদেশীয় রমণীর পরিচ্ছদ! বিস্মিত হইয়া আবার জেলেখার দিকে চাহিলেন, জেলেখা এবার গম্ভীরস্বরে বলিল, “বিলম্ব করিও না, আমরা যে দ্বার দিয়া আসিয়াছি এক্ষণে সে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, চারিদিকে খোজাগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এ বেগমদিগের প্রাসাদ, তুমি পুরুষ জানিলে এইক্ষণেই তোমার প্রাণনাশ করিবে।” নরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন, জেলেখার কথা সত্য; অগত্যা তাতারদেশীয় নারীবেশ ধারণ করিলেন; জেলেখা তাঁহাকে পরচুলা পরাইয়া দিয়া মস্তকের উপর অবগুণ্ঠন ঝুলাইয়া দিল।

নরেন্দ্র জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কতগুলি গৃহ ও পথ অতিবাহিত করিলেন তাহা গণনা করা যায় না। দ্বারে দ্বারে অসিহস্তে খোজাগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও শত শত পরিচারিকা এদিক্ ওদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছে। জেলেখাকে দেখিয়া সকলেই দ্বার ছাড়িয়া দিল।

নরেন্দ্রনাথ বেগমদিগের মহলের অভ্যন্তরে যত যাইতে লাগিলেন ততই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্য, শিল্পকার্য্য ও বিলাসপ্রিয়তার সহায়তায় মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহা নরেন্দ্র অদ্য দেখিলেন। শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত কত ঘর, কত প্রাঙ্গণ, কত সুন্দর স্তম্ভসার, কত উন্নত ছাদ দেখিলেন তাহা গণনা করা যায় না। সেই প্রস্তরে কি অপূর্ব্ব শিল্পকার্য্য! দেয়ালে, স্তম্ভে, প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর শ্বেতপ্রস্তরে সন্নিবেশিত হইয়া লতা, পত্র, বৃক্ষ, পুষ্পের রূপ ধারণ করিয়াছে যেন সুন্দর শ্বেত দেয়ালের পার্শ্বে যথার্থই পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। ছাদ হইতে যেন সেইরূপ পুষ্প লম্বিত রহিয়াছে অথবা সুন্দর সুবর্ণে মণ্ডিত ও চিত্রিত হইয়া অধিকতর শোভা ধারণ করিতেছে। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুন্দর গবাক্ষ, সুন্দর ফোয়ারা, সুন্দর পুষ্পাধার; তাহার উপর কি মনোহর সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া প্রাসাদকে আমোদিত করিতেছে। শ্বেত, পীত, নীল বর্ণের আলোক সেই রঞ্জিত ঘরের ভিতর ও বাহিরে দেখা যাইতেছে। জগতে অতুল্য রূপবতী বেগমগণ কেহ বা সেই ঘরে বা প্রকোষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা পুষ্প

চয়ন করিয়া কেশে ধারণ করিতেছেন, কেহ বা আনন্দে গান করিতেছেন। আজি আনন্দের দিন, রাজপ্রাসাদ আনন্দে ও নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ।

এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্র অন্য একস্থানে আসিলেন; দেখিলেন, সম্রাট্ আরংজীব বেগমদিগের সহিত পচিশী খেলিতেছেন। পচিশীর ঘর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত ও প্রকাণ্ড; এক একটী রূপবতী কামিনী এক একটী ঘুঁটী! ঘুঁটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হওয়া আবশ্যক এই জন্য কামিনীগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন! নরেন্দ্রের হৃদয় চিন্তাকুল, কিন্তু সম্রাটদিগের বিলাসপটুতার এই পরাকাষ্ঠা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

পরে নরেন্দ্র একটী আমোদগৃহে যাইয়া পড়িলেন। ঘরের ছাদ সেইরূপ সুবর্ণ, রৌপ্য ও দ্বিরদরদে খচিত, দেয়ালে সেইরূপ প্রস্তরের পুষ্প, পত্র, লতা, বৃক্ষে খচিত; মর্ম্মরপ্রস্তর বিনির্ম্মিত স্তম্ভসারির উপর সেইরূপ সাটিন ও মকমল বিজড়িত; ও নানা বর্ণের গন্ধদীপ সেইরূপ আলোক ও গন্ধদানে ঘর আমোদিত করিতেছে! ভিতরে তিন চারি জন বেগম বাদ্য ও গীত করিতেছে, সপ্তস্বরমিলিত সেই গীতধ্বনি উন্নত ছাদ উল্লঙ্ঘন করিয়া যমুনা-তীরে ও নৈশ গগনে প্রধাবিত হইতেছে।

সে গৃহ হইতে কিছু দূর যমুনানদীর দিকে একটী শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বারান্দায় সুন্দর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে। এ স্থানটী কি নিস্তব্ধ, কি রমণীয়! উপরে আকাশ নীলবর্ণ, দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে; ও শারদীয় চন্দ্র সুধাবর্ষণ করিয়া গগনকে শোভিত ও জগৎকে তৃপ্ত করি-তেছে। নীচে নীলবর্ণ যমুনানদী কল কল শব্দে প্রধাবিত হইতেছে। তাহার চন্দ্রকরোজ্জ্বল বক্ষের উপর দুই একখানি ক্ষুদ্র পোত ভাসমান রহিয়াছে। দক্ষিণে সুন্দর তাজমহল চন্দ্রকরে অধিকতর সুন্দর দেখা যাইতেছে; নদীর অপরপার্শ্বে পল্লীগ্রাম নিশিতে সুপ্ত; শব্দ প্রায় শুনা যায় না। বারান্দা জনশূন্য, কেবল একজন বেগম বীণাহস্তে গান করিতেছিলেন এক্ষণে পরিশ্রান্ত হইয়া বারান্দার শ্বেতপ্রস্তরে মস্তক রাখিয়া বোধ হয় সুখের বা দুঃখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। যমুনার বায়ু বেগমের মণিমুক্তা-বিজড়িত চন্দ্রকরোজ্জ্বল কেশপাশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে অথবা সে বীণার উপর কখন কখন সুখের গান করিতেছে। বারান্দায় দণ্ডায়-মান হইয়া ও যমুনার সুন্দর গান ও শীতল বায়ু ভোগ করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে নব নব ভাব উদিত হইতে লাগিল। এইরূপ নিস্তব্ধ রজনীতে এইরূপ নদীতীরে নরেন্দ্র দূর বঙ্গদেশে হেমকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া

ছিলেন। আহা! সে সুন্দর মুখখানি চন্দ্র হইতেও সুধাপূর্ণ ও জ্যোতির্ম্ময়। মুহূর্ত্তের জন্য নরেন্দ্রের হৃদয় হেমলতাপূর্ণ হইল; নরেন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে যাইলেন।

সহসা আলোকচ্ছটায় নরেন্দ্রের নয়ন ঝলসিয়া গেল। যখন স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

দেখিলেন সম্মুখে একটী অতি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণে কত অনির্ব্বচনীয় সুন্দর পুষ্পচারা ও পুষ্পলতিকা তাহা বর্ণনা করা যায় না। চতুষ্পার্শ্বস্থ হর্ম্ম্যশ্রেণী হইতে পুষ্পমালা ঝুলিতেছে, বৃক্ষ লতায় পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে স্তূপাকারে পুষ্প রহিয়াছে, চারিদিকে সুগন্ধ পুষ্প বিকীর্ণ রহিয়াছে। সুদর্শন ফোয়ারা যেন দ্রব রৌপ্য-স্তম্ভ নৈশ আকাশে উত্তোলন করিয়া আবার মুক্তারূপে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে! ঝোপে, বৃক্ষের অন্তরালে, সম্মুখে, পার্শ্বে, উর্দ্ধে, নীচে নানা বর্ণের সুগন্ধদীপাবলী জ্বলিতেছে, যেন আজি ইন্দ্রের অমরাপুরী ও সন্তানককে লজ্জিত করিয়া এই বেগমমহল অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়াছে। সেই প্রাঙ্গণে একটী বাজার বসিয়াছে, ক্রেতা বিক্রেতা দলে দলে বিচরণ করিতেছে,—অন্যান্য বাজার হইতে এই ভেদ যে সকলেই রমণী,—বিক্রেতা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজা মহারাজা ও ওমরাহের মহিলাগণ; ক্রেতা সম্রাটের বেগমগণ! যে সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য ক্রীত ও বিক্রীত হইতেছে, যে সমস্ত অনির্ব্বচনীয় বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের শরীর আবৃত ও শোভিত ও যে সমস্ত অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী লাবণ্যময়ী যুবতীগণ সেই বস্ত্র ও সেই অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। তিনি অনেক রাজপ্রাসাদে অনেক অপরূপ শোভা দেখিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ স্বর্গোদ্যানে এরূপ অপ্সরামণ্ডলী কখনও দেখেন নাই।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বৎসর বৎসর নরোজার দিন দিল্লীর সম্রাটগণ বেগমমহলে এইরূপ একটী করিয়া বাজার বসাইতেন, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান মহিলাগণ এই "বাজারে" দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিত, যে ওমরাহ বা রাজার সুন্দরী কন্যা বা রমণী থাকিত, বেগমদিগের সহিত পরিচিতা করিবার জন্য এই বাজারে তাঁহাদের পাঠাইতেন। পুরুষের মধ্যে কেবল স্বয়ং সম্রাট্ আসিতেন। পূর্ব্বপ্রথামতে এই আনন্দের দিন আরংজীব সেইরূপ বাজার বসাইয়াছেন ও স্বয়ং দুই এক বেগমের সহিত এক দোকান

হইতে অন্য দোকানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রাতৃযুদ্ধে আরংজীবের ভগ্নী রৌশন আরা আরংজীবের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন, আগ্রার গুপ্ত সমাচার তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। এক্ষণে আরংজীবের জয় হইয়াছে, সে "বাজারের" মধ্যে রৌশন আরার ন্যায় কাহার গৌরব, কাহার প্রভুত্ব? অন্য ভগ্নী জেহান আরা দারার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, অদ্য এই মহোৎসবের মধ্যে জেহান আরা নাই।

বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে নরেন্দ্রনাথ এই মহোৎসব দেখিতে লাগিলেন; যাহা দেখিলেন তাহাতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, সম্রাট একজন রূপবতী মোগলকন্যার নিকট কতকগুলি অলঙ্কার ও সাটীন ও সুবর্ণখচিত বস্ত্রের দর করিতে আরম্ভ করিতেছেন। দর করিতে উভয়পক্ষই সমান পটু; কখন কখন এক পয়সার বিভিন্নতার জন্য মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইতেছে। আরংজীব বলিলেন, "তোমার জিনিস ভাল নহে, ঠকাইতে আসিয়াছ?" চতুরা মোগল কন্যা বলিলেন, "তুমি এরূপ জিনিস কখনও দেখ নাই, ইহার দর কি জানিবে? তুমি ইহার উপযুক্ত নও, অন্য স্থানে যাও, তোমার উপযুক্ত অল্পমূল্য দ্রব্য পাইবে।" এইরূপ বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর মূল্য অবধারিত হইল। ক্রেতা তখন সেই মূল্য দিয়া যেন ভ্রমক্রমে দুই চারিটী রৌপ্যমুদ্রার স্থানে বিক্রেতাকে সুবর্ণমুদ্রা দিয়া যাইলেন। এইরূপে বিক্রয়কার্য্য শেষ হইল।

অনেকক্ষণ এই অপরূপ "বাজার" দেখিয়া নরেন্দ্র জেলেখার আদেশানুসারে "শিশমহলে" প্রবেশ করিলেন, তথায় আবার অন্যরূপ অপরূপ দৃশ্য দেখিলেন। সম্রাট্ ও বেগমদিগের স্নানার্থ এই মহল নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সানের উপর দিয়া নির্ম্মল জল প্রবাহিত হইতেছে, সেই সানে অঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখিয়া বোধ হয় যেন জলের নীচে অসংখ্য মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। চতুর্দ্দিক্ হইতে ফোয়ারার নির্ম্মল জল বেগে উঠিতেছে, আবার মুক্তারাশির ন্যায় প্রস্তরের উপর পতিত হইতেছে। ছাদ হইতে অসংখ্য দীপাবলি লম্বিত রহিয়াছে ও সেই সমস্ত দীপের বিবিধবর্ণের আলোক ফোয়ারার জলের উপর বড় সুন্দর প্রতিহত হইতেছে। স্থানে স্থানে ফোয়ারার সহিত সানের নীচে হইতে নানাবর্ণের আলোক উত্থিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দর্পণ রত্নরাজি-খচিত হইয়া দেয়ালে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেননা স্নানকারিণী চতুর্দ্দিকেই আপনার সুন্দর অবয়ব দেখিতে পাইবেন। বিলাসপটু সম্রাট্ ও বেগমগণ একত্রে স্নান ও জলকেলি করিতে পারিবেন, এই জন্য কত দেশ হইতে

কত ধন আনীত হইয়া এই অপূর্ব্ব বিলাসগৃহ বিনির্ম্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে।

নানাদেশ হইতে অনেক রাজ্ঞী ও রমণী অদ্য প্রাসাদে সমবেত হইয়াছে ও তাহার মধ্যে অনেকেই শিশমহলের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিল। জেলেখা নরেন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া একটী দর্পণের নিকট আনিল ও তাহার ভিতর দেখিতে বলিল। নরেন্দ্র তাহাই করিলেন। দেখিবামাত্র নরেন্দ্র একেবারে মোহিত ও চকিত হইয়া রহিলেন, তাঁহার শরীরে স্পন্দ নাই, নয়নে নিমেষ নাই,—নরেন্দ্রনাথ প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট। নরেন্দ্রনাথ কি সহসা রোগাক্রান্ত হইলেন? নরেন্দ্রনাথ কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? নরেন্দ্র রোগাক্রান্ত হয়েন নাই, স্বপ্নবিমূঢ় হয়েন নাই;—অদ্য সহসা সেই বহুপূর্ব্ব-দৃষ্টা চিরপূজিতা স্নেহময়ীর সুন্দর ম্লান মুখমণ্ডল দর্পণে দেখিতে পাইলেন। নরেন্দ্র কি করিতেছিলেন বিস্মৃত হইলেন, নরেন্দ্র স্থানকাল বিস্মৃত হইলেন; নরেন্দ্রের নয়ন, নরেন্দ্রের সমস্ত সংজ্ঞা সেই দর্পণদৃষ্ট মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইল, নরেন্দ্রের জীবন স্বপ্নময় ও সেই মূর্ত্তিপরিপূর্ণ! কতক্ষণ ঐ অবস্থায় রহিলেন নরেন্দ্র জানেন না; ক্রমে হেমলতার প্রতিমূর্ত্তি দর্পণ হইতে সরিয়া গেল, তখন নরেন্দ্র চৈতন্য পাইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না; চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। হায়! হেমলতার প্রতি প্রণয়ও এইরূপ ছায়ামাত্র; নরেন্দ্রনাথ! কেন দেশে দেশে সেই ছায়া অনুধাবন করিতেছ?

সহসা একজন অবগুণ্ঠনবতী রাজপুত-বেশ-ধারিণীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি আর কয়েকজন রাজপুত-রমণীর সহিত শিসমহল হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন;—উন্মত্ত নরেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সে রমণী কি হেমলতা? নরেন্দ্র জানে না। কিন্তু নরেন্দ্রের হৃদয় যেদিকে আকৃষ্ট হইল, নরেন্দ্র সেই দিকেই যাইল। নরেন্দ্র ঘন ঘন সেই রমণীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে নিকটে আসিলেন, তথাপি রমণীর অঙ্গুলী ও গঠন ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না; মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া প্রায় দেখা যায় না। নরেন্দ্র কোন কৌশলে বা ছলে সেই অঙ্গুলী স্পর্শ করিতে গেলেন, বোধ হইল যেন সে হস্ত আপন হস্তে ধারণ করিলে স্বর্গসুখ হইবে; কিন্তু যতবার উদ্যম করিলেন ততবার নিষ্ফল হইলেন; হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল; হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল, ললাট হইতে স্বেদ বহির্গত হইতে লাগিল।

একবার ইচ্ছা হইল রমণীর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু নরেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইল। অচিরাৎ সেই রমণী ও তাঁহার রাজপুত-সঙ্গিনীগণ সেই "বাজার" পরিত্যাগ করিলেন। নরেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনেক ঘর, অনেক দ্বার, অনেক পুষ্পোদ্যান ও প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া বাহিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক শিবিকা ছিল, রাজপুত-কামিনীগণ নিজ নিজ শিবিকায় আরোহণ করিলেন। যে রমণীর দিকে নরেন্দ্র দেখিতেছিলেন তিনিও শিবিকায় আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন। বোধ হইল যেন তিনি যমুনানদী ও আগ্রার রাজপ্রাসাদ পূর্ব্বে দেখেন নাই, কেননা শিবিকায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে একবার প্রাসাদ ও নদীর দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যমুনার প্রবল বায়ুতে তাঁহার অবগুণ্ঠন নড়িতে লাগিল; নরেন্দ্র তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল, কিন্তু সে মুখ নরেন্দ্র দেখিতে পাইলেন না; অচিরাৎ শিবিকাযোগে সে রাজপুত-বেশধারিণী চলিয়া গেলেন।

এ কি হেমলতা? সেই গঠন, সেই চলন, সেই অঙ্গুলী নরেন্দ্র সতৃষ্ণ-নয়নে দেখিয়া চিনিলেন, সেই প্রিয় করদ্বয় নিজ করে ধারণ করিতে নিজ বক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থাপন করিতে নরেন্দ্র উন্মত্ত হইয়াছেন; তবে অবশ্য এ সেই হেমলতা। তবে আগ্রায় বেগম মহলে কেন? তবে রাজ-পুত-বেশ কি জন্য? নরেন্দ্রনাথ! প্রেমান্ধ হইয়া কাহাকে হেমলতা মনে করিতেছ? নরেন্দ্র! কেন দেশে দেশে সেই ছায়া অনুধাবন করিতেছ?

পাঠক! হেমলতাকে আমরা বীরনগরে রাখিয়া আসিয়া অনেক দিন অবধি নরেন্দ্রের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলাম, চল একবার বীরনগরে যাইয়া হেমের সহিত পুনরায় দেখা করি।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃস্নেহ।

বীরনগরে জমীদারের প্রকাণ্ড অট্টালিকার পার্শ্বে সুন্দর ও প্রশস্ত উপ-বন ছিল; সেই উপবন দিয়া নদীতীরে আসা যাইত; সেই উপবনে বাল্য কালে নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতা দৌড়াদৌড়ি করিত; সেই নদীকূলে বালক বালিকার সঙ্গে খেলা করিত, হাসিত, কাঁদিত, আবার উচ্চহাস্যে উপবন আমোদিত করিত। আজি মনুষ্যত্বের গম্ভীর চিন্তায় ও বিষয়কার্য্যে সেই

বাল্যকালের হাস্যধ্বনি বিলীন হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ অনাথ, অসহায়, দেশে দেশে বেড়াইতেছেন. শ্রীশচন্দ্র শ্বশুরের সম্প্রতি মৃত্যু হওয়ায় জমীদার হইয়াছেন, হেমলতা আজি বালিকা নহেন, নবজমীদারের গৃহিণী।

সায়ংকালে সেই উপবন দিয়া দুইটী রমণী ঘাটে যাইতেছিলেন। একজন হেমলতা, অপরটী শ্রীশচন্দ্রের বিধবা ভগ্নী শৈবলিনী।

হেমলতার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ হইবে, অবয়ব ক্ষীণ, কোমল ও উজ্জ্বল রূপরাশিতে পরিপূর্ণ। নয়ন দুটী জ্যোতির্ময়, ভ্রূযুগল সুচিক্কণ, ওষ্ঠ সূক্ষ্ম, গণ্ডস্থল রক্তিমাচ্ছটায় আরক্ত, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়; তথাপি যৌবনপ্রারম্ভের প্রফুল্লতা সে অবয়বে লক্ষিত হয় না, যৌবনের উন্মত্ততা সে মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় যেন সে সুন্দর ললাটে, সেই স্থির চক্ষুদ্বয়ে, সেই সুচিক্কণ ওষ্ঠে অকালেই চিন্তার অঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে, নয়নের উজ্জ্বল জ্যোতিকে ঈষৎ স্তিমিত করিয়াছে, যৌবনোদয়ে মুখমণ্ডলের প্রফুল্ল ও আনন্দময়ী আলোকের উপর জীবনের সন্ধ্যার ছায়া বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। হেমলতা দুঃখিনী নহে, কিন্তু চিন্তাশীলা; যৌবনের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য দেখিতে পাইতেছি. কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা কৈ? প্রফুল্লতা থাকিলে কি হেম এরূপ নম্রভাবে ধীরে ধীরে যাইত? ঐ ক্ষুদ্র নতশির পুষ্পটীকে তুলিয়া কি উহার দিকে ঐরূপ স্থিরভাবে চাহিত? হেমলতার মনে দুঃখ নাই, কিন্তু হৃদয় ভারাক্রান্ত, শান্ত, সহিষ্ণু। যে কৃষ্ণবর্ণ সুচিক্কণ কেশপাশে তাহার বদনমণ্ডল ও নয়নদ্বয় ঈষৎ আবৃত হইয়াছে, ধীরে ধীরে সযত্নে সরাইয়া দেখ, নয়নদ্বয়ে জল নাই, তথাপি নয়নদ্বয় স্থির, শান্ত, যৌবনোচিত চপলতাশূন্য। নিকটে যাইয়া দেখ হেমলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে না, তথাপি যেন ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে নিশ্বাস বহির্গত হইতেছে। অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কোরকে দুঃখকীট প্রবেশ করে নাই, তথাপি কোরক জীবনাভাবে যেন ঈষৎ শুষ্ক ও নতশির। হেমলতার জীবন যেন অরুণোদয়ের উজ্জ্বলতা মেঘচ্ছায়ায় বিমিশ্রিত।

শৈবলিনীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। শৈবলিনী বিধবা, অবয়বে যৌবনের রূপ নাই, তথাপি শরীর উন্নত, গম্ভীর ও এক অনির্ব্বচনীয় গৌরবে পরিপূর্ণ। মস্তক হইতে নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, ললাট সুন্দর, চক্ষু বিশাল ও শান্তপ্রভ, মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ কোমল, অবয়ব উন্নত ও বিধবার শুভ্র বসনে আবৃত। শৈবলিনী হেমলতাকে কনিষ্ঠার ন্যায় ভাল বাসিত, সস্নেহ বচনে তাহার সহিত কথা

কহিতে কহিতে ঘাটে যাইতেছিল। শৈবলিনীর জীবন যেন মেঘশূন্য-বায়ুশূন্য সায়ংকাল, গম্ভীর, নিস্তব্ধ, শান্ত।

বাল্যকালে হেমলতা নরেন্দ্রনাথের মুখ দেখিলে ভাল থাকিত, যৌবন-প্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ হেমলতার হৃদয়ের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল, হেমলতা বুঝিতে পারিত না কিন্তু তাহার জীবন নরেন্দ্রনাথপূর্ণ হইয়াছিল। যখন সেই নরেন্দ্রের সহিত চির-বিচ্ছেদ হইল, যখন হেমলতার পিতার কাল হইল, যখন হেম আর একজনের সহধর্ম্মিণী হইয়া নরেন্দ্রের প্রতিমাকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইল, তখন প্রেম কি পদার্থ হেম বুঝিতে পারিল, তখন মর্ম্মভেদী দুঃখ আসিয়া হেমের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বালিকা সরলা, নবোঢ়া বধূ, সে কথা কাহার কাছে বলিবে, সে দুঃখ কাহার কাছে জানাইবে, সে ভীষণ দুঃখ কে দেখিতে পাইত, সমস্ত রজনী জাগরিত থাকিয়া হেম নরেন্দ্রের জন্য রোদন করিত, আহা! সে কে দেখিত, কে শুনিত! এইরূপ ঘোর দুঃখে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল, জীবনালোক নির্ব্বাণপ্রায় হইল, এই সুন্দর জগতে হেমলতার থাকিবার স্থান রহিল না।

শৈবলিনী পঞ্চ বর্ষের সময়ই বিধবা হইয়াছিল, শ্বশুরালয়েই থাকিত, কখন কখন ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। শৈবলিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধি-মতী, দুই তিন বার বীরগ্রামে আসিয়াই হেমলতার অন্তরের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিল, মনে মনে সঙ্কল্প করিল, "যদি বালিকাকে আমি যত্ন না করি বোধ হয় ভ্রাতার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে," সেই অবধি বীরগ্রামে রহিল।

শৈবলিনীর সস্নেহ ব্যবহারে ও প্রবোধ বাক্যে হেমলতার দুঃখভার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইল। শৈবলিনী মানবচরিত্র বিশেষরূপ জানিত, একবারও হেমকে তিরস্কার করিত না, কনিষ্ঠা ভগিনীকে যেন প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিত। তাহার সারগর্ভ স্নেহপরিপূর্ণ কথায় কোন্ দুঃখিনীর দুঃখ না বিমোহিত হয়? শৈবলিনী গল্প করিতে অতিশয় পটু; সর্ব্বদাই হেমলতাকে পুরাণের গল্প বলিতেন। সে পবিত্র মুখে সে পবিত্র গল্প শুনিতে শুনিতে হেমলতা রজনীতে নিদ্রা বিস্মরণ হইত। গভীর রজনী, গভীর বন, চারি দিকে বৃক্ষের অন্ধকার দেখা যাইতেছে, বায়ুর ভীষণ শব্দ ও হিংস্রক জন্তুর ভীষণতর নাদ শুনা যাইতেছে। রাজকন্যা দময়ন্তী অদ্য অভাগিনী বেশে স্বামীর প্রেমকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া ধন মান রাজ্য তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভিখারিণী বেশে বিচরণ করিতেছে।

স্বামী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে গণ্ডূষ করিয়া জল দিতেছে, স্বামী বস্ত্রহীন হইলে আপন বস্ত্র দিতেছে; স্বামী পরিশ্রান্ত হইলে আপন অঙ্কে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিয়া স্বয়ং অনিদ্র হইয়া উপবেশন করিয়া আছে। সেই স্বামী যখন মায়াজাল বিদীর্ণ করিয়া অভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল তখনও অভাগিনীর স্বামী-চিন্তা ভিন্ন এ জগতে আর চিন্তা নাই; স্বামীর পুনর্ম্মিলন ভিন্ন এ জগতে আর আশা নাই। অথবা সেই মহর্ষি বাল্মীকির কুটীরে চিরদুঃখিনী বৈদেহী হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া এখনও হৃদয়ের একেশ্বরকে চিন্তা করিতেছে। সম্মুখে পুত্র দুইটী খেলা করিতেছে; তাহাদিগের মুখ অবলম্বন করিতেছে আবার শ্রীরামের চিন্তা করিতেছে। যিনি নিরাশ্রয়া নিষ্কলঙ্কা অন্তঃসত্বা রাজকন্যা রাজরাণীকে চিরনির্ব্বাসিত করিয়াছেন সেই নিষ্ঠুর পতিকেও অদ্যাবধি হৃদয়ে স্থান দিয়া অভাগিনী চিন্তা করিতেছে; সেই কমললোচন সীতার জীবনের জীবন, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন! পতিব্রতার কি মাহাত্ম্য! পতিব্রতা কি পবিত্র অমূল্য রত্ন!

রজনী তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত হেমলতা তাহার ধর্ম্মপরায়ণা ননদিনীর নিকট এই সকল পুণ্য কথা শুনিত, দুঃখকথা শুনিয়া হৃদয় আলোড়িত হইত, ননদিনীর হৃদয়ে বদন ঢাকিয়া দর-বিগলিত ধারায় রোদন করিত, আবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র কথা শুনিত, আবার শোকাকুল হইয়া অবারিত অশ্রুজল ত্যাগ করিত। ভাবিত "সংসারে সকলেই দুঃখিনী, পুণ্যাত্মা সীতা দুঃখিনী, ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রী দুঃখিনী, আমি কে অভাগিনী যে নিজ দুঃখে বিহ্বলা হইয়া রহিয়াছি। তাঁহারা সাধ্বী ছিলেন, পতিব্রতা ছিলেন, অভাগিনী হেমলতা আজিও নরেন্দ্রের চিন্তা করে,—দেবতুল্য স্বামীকে বিস্মরণ হইয়া আছে। আমি অবলা, আমার বল নাই, ভগবান সহায় হও, পাপচিন্তা হৃদয় হইতে উৎপাটিত কর, অবলার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবে।" এইরূপ ভাবনা আসিতে আসিতে আবার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িত, আবার শৈবলিনী অভাগিনীকে আপন ক্রোড়ের দিকে লইত।

শৈবলিনীর অপরূপ স্নেহ ও প্রবোধ্যবাক্যে হেমলতা ক্রমশঃ শান্তি লাভ করিল, হৃদয়ের প্রথম প্রেমস্বরূপ ভীষণ শেল উৎপাটিত হইল, কিন্তু অনেক দিনে, অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে, সে ফল লাভ হইল। সেই ভীষণ অস্বাভাবিক পরিশ্রম ও চেষ্টায় যৌবনের প্রফুল্লতা শুষ্ক হইয়া গেল, অবয়বে চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইল, হেমলতা আজি আর দুঃখিনী নহে, কিন্তু স্বভাবতঃ বিষণ্ণবদনা, নম্র ও নতশির।

এক্ষণে হেমলতা ও শৈবলিনী সর্ব্বদাই নরেন্দ্রের কথা কহিত, বাল্যকাল অবধি শৈবলিনী নরেন্দ্রকে ভ্রাতা বলিত, এখন হেমও তাহাকে ভ্রাতার স্বরূপ জ্ঞান করিত। ভ্রাতার বিপদে বা অবর্ত্তমানে অবশ্যই ভগ্নীর চিন্তা হয়, হেমও নরেন্দ্রের জন্য ভাবিত, কিন্তু তাহার হৃদয় আর পূর্ব্ববৎ বিচলিত হইত না। কিম্বা যদি কখন কখন সায়ংকালে সেই উপবনে একাকী বিচরণ করিতে করিতে হেমের বাল্যকালের কথা মনে পড়িত, ভাগীরথীর কল কলনাদ শুনিয়া, মেঘশূন্য নীল গগনমণ্ডলে উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া, শীতল হরিৎ কুঞ্জবনে উপবেশন করিয়া, বাল্যকালে এ সমস্ত দ্রব্যের সহিত আর যে একটী রমণীয় দ্রব্য দেখিত তাহাকে যদি কখন কখন মনে পড়িত; যদি সে কথা মনে পড়িয়া হেমের চক্ষে একবিন্দু জল লক্ষিত হইত,—পাঠক, সে ভ্রাতৃস্নেহের নিদর্শনস্বরূপ বলিয়া মার্জ্জনা করুন। ভ্রাতৃস্নেহ ভিন্ন অন্য কোন ভাবে সে অশ্রুবিন্দু দেখাগিয়াছে কি না জানি না, হেমলতাও জানে না; যদি অন্য কোন ভাবের একবিন্দুও থাকে, সেটুকু অভাগিনী হেমকে মার্জ্জনা করুন। সে ভাব তিরোহিত করিবার জন্য হেম অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক সহ্য করিয়াছে, অভাগিনী অনেক কাঁদিয়াছে; সেই চেষ্টায় সে ভাব তিরোহিত হইয়াছে, যদি হৃদয়ের কন্দরে অল্প পরিমাণে লুক্কায়িত থাকে, সেটুকু অভাগিনী হেমকে ক্ষমা করুন।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পুরাণ কথা।

ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেমলতা ও শৈবলিনী গৃহের সমস্ত কার্য্যাদি সমাপন করিলেন; পরে দুইজনে একটী ঘরে বসিয়া হেম বলিল, "দিদি অনেক দিন অবধি গল্প শুনি নাই, আজ একটু অবসর আছে একটী গল্প বল না!"

শৈবলিনী সস্নেহ বচনে উত্তর দিলেন, "বল্‌বো বৈ কি বৌ, কোন্ গল্প বলিব বল।"

হেম বলিল, "রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প অনেক দিন শুনি নি, সেই গল্প বল।" শৈবলিনী হরিশ্চন্দ্রের গল্প বলিতে লাগিল।

মহাভারতের যথার্থই অমৃতের কথা, সে গল্প কি মিষ্ট, কি সুললিত, কি হৃদয়গ্রাহী! রাজার রাজ্য গেল, ধন গেল, মান গেল, স্ত্রী-পুত্র লইয়া

বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী শৈব্যা এক্ষণে রাজার একমাত্র রত্ন,—কি অমূল্য রত্ন! সুখের সময়, সম্পদের সময়, রমণী অস্থিরা, চঞ্চলচিত্তা, মানিনী! কত আবদার করে, কতবার ক্রোধ করে! কিন্তু যখন জীবনাকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হইতে থাকে, যখন পৃথিবীর সমস্ত সুখ নাট্যাভিনয়ের শেষে নাট্যমন্দিরে দীপশ্রেণীর ন্যায় ক্রমশঃ নিস্তেজ ও একে একে নির্ব্বাণ হইতে থাকে, যখন আশা মরীচিকারূপে আমাদের অনেক পথ লইয়া যাইয়া শেষে মরুভূমিতে রাখিয়া অদৃশ্য হয়, যখন বন্ধুগণ আমাদিগকে ত্যাগ করে, লক্ষ্মী বিমুখ হয়; তখনও কে অনন্যমনা ও অনন্যহৃদয়া হইয়া অভাগার শুশ্রূষা করে? মাতা ব্যতীত আর কে হতভাগার শয্যা রচনা করে? দুহিতা ব্যতীত আর কে রোগীর শুষ্ক ওষ্ঠে জল দান করে? ভার্য্যা ব্যতীত আর কে নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, ক্লান্তি বিস্মৃত হইয়া, দিবানিশি হতভাগার সেবায় রত থাকে? পতিকে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে? রমণীর প্রেম অগাধ, অপরিসীম; দারিদ্র্যে, দুঃখে, কষ্টেও শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে সেবা করিতে লাগিলেন। সে দুঃখের কথা শুনিয়া হেমলতার চক্ষুতে জল আসিল।

তাহার পর আরও দুঃখ, রাজা শৈব্যাকে ও পুত্রটীকে বিক্রয় করিলেন, আপনাকে চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিলেন; অভাগিনী শৈব্যা স্বামীবিরহে আপনি কায়িক পরিশ্রমে আপনার ও পুত্রটীর ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন; আহা! সে পুত্রটিও অকালে কাল প্রাপ্ত হইল।—হেমলতা আর থাকিতে পারিল না, ননদিনীর হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া দর-বিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিল।

গল্প সাঙ্গ হইল, রাজা রাজ্ঞীকে ফিরিয়া পাইলেন, পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন, রাজ্য সম্পদ সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন। হেমলতার হৃদয় শান্ত হইল; অনেকক্ষণ, প্রায় এক দণ্ডকাল, উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; অনেকক্ষণ পর হেমলতা ধীরে ধীরে উঠিয়া একটী বাতায়ন খুলিল—বাহিরে চন্দ্রকরে জগৎ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, নৈশ বায়ুতে বৃক্ষগণ ধীরে ধীরে মস্তক নাড়িতেছে; দূর হইতে গঙ্গার জলের কুল্‌কুল্‌ শব্দ শুনা যাইতেছে।

শৈবলিনী ধীরে ধীরে হেমলতার নিকট আসিয়া ভগ্নীর ন্যায় সস্নেহে তাহার হস্ত ধারণ করিল। হেম কি ভাবিতেছিল?—ভাবিতেছিল ঐ বৃক্ষের পাতায় পাতায় কত জোনাক পোকা দেখা যাইতেছে, উহাদেরও জীবন আছে; সুখ, দুঃখ, ভরসা, ইচ্ছা আছে; যে ভগবান রাজা

হরিশ্চন্দ্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তিনিই এই নিশায় অনিদ্র হইয়া ঐ পোকাগুলিকে খাদ্য যোগাইতেছেন, উহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন ; এই বিপুল বিশ্বসংসারে সকল জীবজন্তুকে তিনিই রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে নিবিষ্টমনে পূজা করি, আমাদেরও তিনিই রক্ষা করিবেন।

হেমলতা বালিকা-সুলভ সরলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, যিনি দয়ার সাগর, তিনি তোমাকে এরূপ অল্পবয়সে বিধবা করিলেন কেন ?"

শৈব। "সকলের কপালে কি সকল সুখ থাকে ? তিনি আমাকে বিধবা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখিনী করেন নাই। দেবতুল্য ভ্রাতা দিয়াছেন, তোমার ন্যায় সুশীলা ভ্রাতৃজায়া দিয়াছেন, এই সোণার সংসারে স্থান দিয়াছেন ; আমার আর কিছুই কামনা নাই, কেবল একবার তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পূজা করিব এই ইচ্ছা।"

হেম। "আমাদের কাশী বৃন্দাবন যাওয়ার কথা স্থির হইয়াছিল না ?"

শৈব। "হাঁ, শ্রীশ আমার উপরোধে সম্মত হইয়াছেন, বোধ হয় শীঘ্রই যাওয়া হইবে।"

হেম। "দিদি, তোমার সঙ্গে তীর্থে যাইব ভাবিলে আমার বড় আহ্লাদ হয় ; কত দেশ দেখিব, কত তীর্থ দেখিব ! আর শুনিয়াছি নরেন্দ্রনাথ পশ্চিমে আছেন, হয়ত তাঁহার সঙ্গেও দেখা হইবে।"

শৈব। "হইতে পারে" বলিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি শৈবলিনী কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইল। এমন সময় শ্রীশচন্দ্র সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। শৈবলিনী এক পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া যাইল।

শৈবলিনীর কি চিন্তা ?—বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া শৈবলিনী ভাবিতেছিল, "হেম ! তুমি আমাকে বিধবা বলিয়া অভাগিনী বল ; কিন্তু নারীতে যাহা কখনও সহ্য করিতে পারে না, বালিকা ! তুমি তাহা সহ্য করিয়াছ। সে আঘাতে তোমার হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে, তোমার জীবন শুষ্ক হইয়াছে ; এ বয়সে তোমার দুর্ব্বল শরীর ও নীরস ওষ্ঠ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এ বিষম চিন্তার কথা ভ্রাতা কিছুই জানেন না ; তুমি বালিকা, তুমিও ভাবিয়াছ এ চিন্তা নির্ব্বাণ হইয়াছে ; কিন্তু নরেন্দ্রের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইলে কি হয় জানি না। ভগবান অনাথার নাথ, অসহায়ের সহায় হইবেন।"

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

তীর্থযাত্রা।

হেমলতা হরিশ্চন্দ্রের গল্প শুনিতে শুনিতে চিন্তায় অভিভূতা ছিলেন, এক্ষণে স্বামীর উদার মুখমণ্ডল সে চিন্তা দূর করিল। শ্রীশচন্দ্র সস্নেহে হেমের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আজ ভাল আছ ?" হেম ধীরে ধীরে কেবলমাত্র বলিলেন, "হাঁ আছি।"

অন্য কথা কহিবার সময় ছিল না। শৈবলিনী ঘরের ভিতর আসিলেন ও ভ্রাতাকে আসন দিয়া ভোজনে বসাইয়া আপনি পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। হেমলতা শীঘ্র সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীর ভোজন দেখিতে লাগিলেন।

ভ্রাতা ভগিনীতে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতে লাগিল, শ্রীশচন্দ্রের খাওয়া সাঙ্গ হইল; রাত্রি অধিক হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ শয়নের উদ্যোগ করিলেন, শৈবলিনী অন্য গৃহে গেলেন।

তখন হেমলতা ধীরে ধীরে যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে আসিলেন, ও বিনীতভাবে তাম্বূল দিলেন। অদ্য শ্রীশের অন্তঃকরণ কিছু আহ্লাদিত ছিল, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "আমি তাম্বূল লইব না।" উদ্বিগ্নচিত্তে হেম জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ?"

শ্রীশ। "তুমি কি দাসী যে এরূপ ভয়ে ভয়ে পান দিতেছ ?"

হেমলতা ভূমির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে কি করিব ?"

শ্রীশ সস্নেহে হেমের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "চিরকালই কি এই শুষ্ক মুখখানি দেখিব ? কবে তুমি শরীরে একটু সারিবে, কবে তোমার মুখখানি প্রফুল্ল দেখিব ?"

হেম কি উত্তর দিবে জানে না। একবার স্বামীর দিকে নয়ন দুইটী তুলিয়া আবার বিনীতভাবে ভূমির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার শরীর ত এখন ভাল আছে ?"

শ্রীশ বলিলেন, "হাঁ, ঈশ্বরেচ্ছায় শরীর অল্প সারিয়াছে, কিন্তু মনে উল্লাস কৈ ?"

হেম বালোচিত সরলতায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "উল্লাস কি ?"

"শ্রীশ। "মনের স্ফূর্ত্তি কৈ ? কবে তোমাকে সুখী দেখিব ?"

হেম আবার স্বামীর দিকে বিনীত দৃষ্টি করিয়া আবার ভূমির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কৈ আমার মনে কোন কষ্ট নাই।" হেমলতা সত্য কথাই কহিয়াছিলেন, মনের মধ্যে কোন কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পায় নাই। তবে উল্লাস? হেমের কপালে সেটী ঘটে নাই।

শ্রীশ দেখিলেন, হেমকে বুঝান সহজ নহে। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখখানি সহাস্য দেখিব কবে?"

হেম আর উত্তর করিতে পারিলেন না। ভূমির দিকেই চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ একটী কথা মনে পড়িল; এবার হেম অল্প হাসিয়া বলিলেন, "যবে তুমি আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিবে।"

শ্রীশ। "কি প্রতিজ্ঞা?"

হেম। "তীর্থযাত্রা।"

শ্রীশচন্দ্র এবার কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। হেমলতা ও শৈবলিনীর উপরোধে অনেকবার তীর্থযাত্রা করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উদ্যোগ করেন নাই। অদ্য হেমলতার কথায় কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিলেন—

"যদি যথার্থই তীর্থযাত্রা করিলে তোমার শরীর ও মন ভাল থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই যাইব। কল্য হইতেই আমি যাত্রার আয়োজন করিব।"

হেম অতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন, কিন্তু স্বাভাবিক লজ্জা বা বিনীতত্ববশতঃ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। হেমের হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতা ও পরিতৃপ্তির ভাব উদয় হইয়াছিল তাহা শ্রীশচন্দ্র হেমের মুখ দেখিয়াই জানিতে পারিলেন। অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হেমকে আরও নিকটে আনিয়া সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন—"কল্যই আমি উদ্যোগ করিব; আজ অধিক রাত্রি হইয়াছে, যাও খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে; আর অধিক বিলম্ব করিও না।"

হেম ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আহারাদি করিতে গেলেন। শৈবলিনী হেমের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুই জনে একত্রে আহারাদি সমাপন করিলেন, পরে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া হেম স্বামীর কক্ষে যাইলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে, দ্বিপ্রহর রজনীতে হেমলতা একাকী স্বামীর মন্দিরে স্বামীর শয্যায় যাইতেছেন; কিন্তু যৌবনের উদ্বেগ কৈ? উল্লাস কৈ? যৌবনের প্রারম্ভে যে সমস্ত অনিশ্চিত স্বপ্নসম চিন্তা ও ভাবে হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে তাহা কোথায়? ধীরে ধীরে হেমলতা স্বামীমন্দিরে

যাইয়া নিদ্রিত স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন; সমস্ত দিনের কাযকর্ম্মের পর অচিরাৎ নিদ্রিত হইলেন।

উপরিউক্ত ঘটনার অল্পদিন পরই শ্রীশচন্দ্র সপরিবারে পশ্চিম যাত্রা করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ সমস্ত তীর্থস্থান দেখিয়া অবশেষে মথুরা ও বৃন্দাবন যাইবার মানসে অগ্রায় পঁহুছিলেন। তথায় শ্রীশচন্দ্র প্রধান প্রধান হিন্দু রাজাদিগের সহিত আলাপ করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন রাজার উপরোধে শ্রীশ সেই রাজার পরিবারের সহিত আপন পরিবারকে নরোজার দিন প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হেমলতা অগত্যা রাজপুত-মহিলার বেশ ধরিয়া রাজপুত-রমণীদিগের সহিত আগ্রার বেগমমহলে গিয়াছিলেন।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জেলেখার পত্র।

নরেন্দ্র আগ্রাদুর্গের ভিতর হেমলতার মুখচ্ছবি দেখিয়া প্রায় হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধ আকাশ ও শান্তপ্রবাহিণী নদীর দিকে চাহিতে চাহিতে সেই চন্দ্রালোকে ধীরে ধীরে আপন গৃহে যাইলেন।

গৃহে প্রবেশ করিলেন একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল, লোক কেহ নাই। নরেন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকের বস্ত্র খুলিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে একখানি পত্র ভূমিতে পড়িয়া যাইল। নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিলেন উর্দু ভাষায় লিখিত। নরেন্দ্র প্রদীপের নিকট বসিয়া পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অধিক না পড়িতে পড়িতেই বুঝিতে পারিলেন জেলেখার পত্র। তখন অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রে এই লিখা ছিল;—

"নরেন্দ্র!

"আমি পাগলিনী, আমি অভাগিনী, সেই জন্য এই পত্র লিখিতেছি। আমি চক্ষুতে আর দেখিতে পাইতেছি না, আমার মস্তক ঘুরিতেছে তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার মনের কথা তোমাকে বলিয়া যাই। তুমি যখন এই পত্র পড়িবে তখন অভাগিনী আর এ জগতে থাকিবে না।

"আমি শাজিহানের জ্যেষ্ঠকন্যা জেহান আরা বেগমের পরিচারিকা; যেদিন বারাণসীর যুদ্ধ হয়, কার্য্যবশতঃ আমি ও মসরুর নামে খোজা

রাজা জয়সিংহের শিবিরে ছিলাম। সেই দিন আহত ও অচেতন হইয়া তুমি সেই শিবিরে আনীত হও, সেই দিন তোমাকে দর্শন করিয়া কালসর্প হৃদয়ে ধারণ করিলাম, বিষম হলাহল পান করিলাম।

"দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, আমি সেই হলাহল পান করিতে লাগিলাম। অশ্রান্ত হইয়া সেই পীড়াশয্যার উপর নত হইয়া থাকিতাম, অনিদ্র হইয়া সেই নিদ্রিত কলেবর নিরীক্ষণ করিতাম। ঐ আয়ত নয়ন দুটী, ঐ প্রশস্ত ললাট, ঐ রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দুটীর দিকে দেখিতাম আর পাগলিনীপ্রায় হইতাম। পীড়াবশতঃ কখন তুমি কাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতে, আমি নিঃশব্দে মনের দুঃখে রোদন করিতাম। পীড়াবশতঃ কখন সস্নেহে আমার হস্ত ধরিতে, আমি পাগলিনী; আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইত! ঐ তেজোময় জ্যোতিম্ময় মূর্ত্তির ভিতর ঈশ্বর পাষাণহৃদয় সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা তখন জানিতাম না।

"ক্রমে বারাণসী হইতে নৌকাযোগে তুমি দিল্লীতে আনীত হইলে; আমি কোন ছলে তোমাকে রাজপ্রাসাদের ভিতর আনিয়া আপন ঘরে রাখিলাম; তথায় সেইরূপ তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতাম; চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, রজনী যাপন করিতাম; যখন আর পারিতাম না তখন খেদে, আনন্দে রোদন করিয়া তোমার পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতাম।

"দুষ্ট মসরুর তোমার কথা সাহেব বেগমকে জানাইল! প্রাসাদের ভিতর পুরুষ আনিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার ও তোমার প্রাণ সংহারের আদেশ দিলেন। আবার মসরুর যাইয়া সাহেব বেগমকে কি বলিল; কি বলিল জানি না, কিন্তু পরে শুনিলাম তোমার অপূর্ব্ব বীরত্ব ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াছিল। যাহা হউক বেগম পূর্ব্বের আজ্ঞা রোধ করিলেন, আমাকে এই ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন ও তোমার আরোগ্যের পর স্বয়ং আমাদের দোষের বিচার করিবেন এইরূপ আদেশ দিলেন।

"আমি বন্দী হইলাম, দিবারাত্রি ঘরে একাকী বসিয়া থাকিতাম;— না একাকী নহে, নরেন্দ্র! তুমি আমার হৃদয়ে বাস করিতে। আমি এক্ষণে আর কোন কথা গোপন করিব না, আমার মৃত্যু সন্নিকট, লজ্জা অনাবশ্যক।

"তোমাকে না দেখিয়া অসহ্য যাতনা হইত, অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বাররক্ষক ও মসরুরের অনেক খোসামদ করিয়া গোপনে তোমাকে দেখিতে যাইতাম। তখন তুমি আরোগ্যলাভ করিয়াছ, কখন কখন আমার দিকে চাহিয়া দেখিতে তাহা কি স্মরণ হয়? আমি অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতাম না, কথা কহিতে পারিতাম না, নিষ্ঠুর

মসরুর আমাকে শীঘ্রই আপন ঘরে পাঠাইয়া দিত, তথায় যাইয়া আমি আবার সেই দেবকান্তির চিন্তা করিতাম।

"ক্রমে বিচারের দিন সমাগত হইল; সে দিন তোমার স্মরণ আছে? সিংহাসনোপবিষ্টা জেহান আরার চারিদিকে পরীবেশে যে সহচরীগণ দাঁড়াইয়াছিল তাহা তোমার স্মরণ আছে? সাহেব বেগম সেই দিন প্রথমে তোমাকে দেখিলেন; যে কঠোর আজ্ঞা দিলেন তোমার স্মরণ আছে? শাহজাদী! আমার পাপের কি এই উচিত দণ্ড? তুমিও স্ত্রীলোক, তোমার হৃদয় কি পাষাণ, কখনও বিচলিত হয় নাই? তবে আমি বাঁদী; আমার স্বাধীনতা নাই, কিন্তু স্বাধীনতার সহিত কি হৃদয়ের ভাবগুলিও বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম? আমার পাপের দণ্ড দিলে, কিন্তু তুমি সিংহাসনোপবিষ্টা রাজদুহিতা আমা অপেক্ষাও যে ঘোর পাপীয়সী, তাহার কি দণ্ড নাই?

"কি কৌশলে সেই রাত্রি আমি দুর্গ হইতে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিলাম তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার পরই সৈনিকবেশে তুমি দিল্লী ত্যাগ করিলে, এ অভাগিনীও দেওয়ানা নাম ধারণ করিয়া পুরুষবেশে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইল। নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব এরূপ আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই; দিবারাত্রি তোমার নিকটে থাকিব, দিবা-রাত্রি তৃষার্ত্ত চাতকের ন্যায় তোমার অপূর্ব্ব মুখকান্তির দিকে চাহিয়া থাকিব, দিবসে তোমার অমৃত কথা শ্রবণ করিব, রজনীতে সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, কখন কখন দ্বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত তোমার সুপ্ত-কান্তির উপর চাহিয়া চাহিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব, জগতে অতুল্য স্বর্গে অতুল্য সুখ লাভ করিব,—কেবল এই আশায় আমি তোমার সহিত দিল্লী হইতে শিপ্রাতীরে, শিপ্রাতীর হইতে রাজস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি! জগতে কোন্ স্থল আছে, নরকে কোন্ স্থল আছে, যথায় এই সুখের আশায় অভাগিনী যাইতে পরাঙ্মুখ!

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পত্র সমাপ্ত।

"নরেন্দ্র! তুমি ভালবাসিয়াছ, যে হিন্দুরমণী তোমার প্রণয়ের পাত্রী তাহাকেও আমি দেখিয়াছি, কিন্তু তুমি কখনও দেওয়ানা হও নাই। আমার তাতার দেশে জন্ম, তথাকার সকলেই উগ্রস্বভাব, কিন্তু আমি

বাল্যকাল হইতেই অতিশয় উগ্রস্বভাব ছিলাম। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সবল বালকগণও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বালিকার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইত, আমি যাহাকে ভালবাসিতাম তাহাকে দিবারাত্রি নিকট হইতে যাইতে দিতাম না। একটী যুদ্ধে আমার পিতা হত হয়েন, আমি রুদ্ধ হইয়া বাঁদী অবস্থায় দিল্লীর সম্রাটের নিকট বিক্রীত হইলাম। স্বাধীনতা গেল, কিন্তু উগ্রস্বভাব গেল না, বোধ হয় ভারতবর্ষের উষ্ণতর সূর্য্যতাপে আমার শোণিত ক্রমশঃ উষ্ণতর হইল। প্রাসাদে তাতার-রমণীদিগের কি কায বোধ হয় তুমি জান। আমরা বেগমদিগের মহল রক্ষা করি, খড়্গ ও ছুরিকা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতে হয়; বেগমদিগের আদেশে কত দুর্ঘটনা সংঘটন হয় তাহা জগৎ সাধারণ কি জানিবে? আমি এ সমস্ত নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতাম না, কিন্তু যখন যথার্থ ক্রুদ্ধ হইতাম তখন সকলের অসাধ্য অসংসাহসী কার্য্যে লিপ্ত হইতেও সঙ্কোচ করিতাম না। আমার এই গুণের জন্যই বেগম সাহেব আমার এরূপ ক্রোধ সহ্য করিতেন।

"যখন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া তোমার সহিত আসিলাম, আমার স্বভাব কিছুমাত্র অন্যথা হইল না, কেবল যেরূপ উগ্রস্বভাব দেওয়ানা জন্মিয়াছিলাম, সেই ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তোমার দিকে দেখিতে দেখিতে আমি কখন কখন যথার্থই সংজ্ঞা হারাইতাম, দেওয়ানা হইতাম। ইহাকে ভালবাসা বলে কি না জানি না, কিন্তু আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইত, আমি হৃদয়ের পিপাসায় অস্থির হইতাম; আবার সেই হলাহল পান করিতাম, আবার তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতাম, আবার উন্মত্তপ্রায় হইতাম। ইহার নাম সুখ কি ক্লেশ তাহা বলিতে পারি না, কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, এ অবস্থা আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চাহিতাম না, বেহস্তে প্রধানতম হুরীকেও আমি হিংসা করিতাম না। এইরূপ দেওয়ানা হইয়া আমি তোমার সহিত রাজস্থানে যাই। তথায় সহসা আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল।

"উদয়পুরের হ্রদে নৌকা করিয়া সন্ধ্যার সময় চন্দ্রালোকে বেড়াইতে যাইতে, স্মরণ হয়? তোমাকে সর্ব্বদাই চিন্তিত দেখিতাম, ভাবিতাম সেই বীরস্থান দেখিয়া তোমার হৃদয়ে বীরচিন্তা উদয় হইত। একদিন আমি নৌকায় বসিয়াছিলাম, তুমি আমার অঙ্কে মস্তক দিয়া শুইয়াছিলে ও অর্দ্ধ ঘণ্টা চন্দ্রের দিকে দেখিতেছিলে, স্মরণ হয়? আমিও সমস্ত সময় তোমার চন্দ্রকরোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম, তোমার কেশ বিন্যাস করিয়া

দিতেছিলাম, তোমার অঙ্গুলী লইয়া খেলা করিতেছিলাম! সহসা তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলে হেম! আর কি তোমাকে এ জীবনে দেখিব?' আমি বঙ্গভাষা ভাল জানি না, কিন্তু এ কথা বুঝিলাম; দন্ত কড়মড় করিয়া উঠিলাম, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া নৌকায় নিপতিত হইলাম, স্মরণ হয়? পূর্ব্বে জানিতাম তুমি পাষাণহৃদয়, সে দিন জানিলাম তোমার হৃদয় আছে কিন্তু সে আমার নহে,—অন্যের!

"সে রাত্রির যন্ত্রণা বর্ণনা করা যায় না। আমি তোমার প্রণয়ভাজন হইব এরূপ কখন আশা করি নাই, কিন্তু যাহাকে আমি পূজা করিতেছিলাম, যাহার জন্য আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম, যাহার জন্য আমি দেওয়ানা হইয়াছিলাম, তিনি অন্যের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এ চিন্তা অসহ্য। চিন্তায় আমি উন্মত্তপ্রায় হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলাম; সেই রজনীতেই তোমার প্রাণসংহার করিব স্থিরসঙ্কল্প হইলাম। আমাকে দোষ দিও না, বঙ্গদেশের রীতিনীতি আমি জানি না, আমি ধর্ম্মের উপদেশ কখন শুনি নাই; আমি অশিক্ষিতা উগ্রমতি তাতারবালা; আমি দেওয়ানা; দেওয়ানার ন্যায় ভালবাসিতাম, দেওয়ানার ন্যায় এক্ষণে জিঘাংসায় পরিপূর্ণ হইলাম। আমার হৃদয় যাহা বলিল আমি তাহাই করিলাম, লতার ন্যায় তোমার পদতলে পড়িয়াছিলাম, কালসর্পের ন্যায় তোমায় দংশন করিতে প্রস্তুত হইলাম।

"আমার উন্মত্ততার আধিক্য দেখিয়া তুমি এক সপ্তাহ রুদ্ধ করিয়া রাখ, স্মরণ হয়? সেই উপায় দ্বারা তুমি আপন জীবন বাঁচাইলে, এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ক্রোধ অনেক হ্রাস হইল, আমি অন্য কৌশল চিন্তা করিতে লাগিলাম।

"তোমার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দেখিয়া আমি একলিঙ্গ-মন্দিরের গোস্বামীদিগের নিকট আপন ইষ্টলাভের জন্য যাইলাম। প্রথম যাঁহার নিকট যাইলাম তিনি পরম তেজস্বী ও ধার্ম্মিক, আমার সমস্ত প্রস্তাব শুনিয়া আমাকে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে তিন চারি জনের নিকট অবমানিত হইয়া অবশেষে সেই কৃষ্ণপরিচ্ছদ শৈবের নিকট যাইলাম। তিনি অনেক অর্থলোভে সম্মত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিন সহস্র মুদ্রার একটী হীরক-বলয় তাঁহার হস্তে পরাইয়া দিলাম, আর বিংশতি সহস্র মুদ্রার একটী মুক্তমালা তাঁহার সম্মুখে দোলাইয়া বলিলাম, 'যদি ছলে বলে কৌশলে নরেন্দ্রকে হেমলতার চিন্তা ত্যাগ করাইতে পার, মুসলমান ধর্ম্ম

অবলম্বন করাইতে পার, আমাকে গ্রহণ করাইতে পার, তবে এই মুক্তাহার তোমার গলায় স্বহস্তে পরাইয়া দিব।'

"এত অর্থ কোথায় পাইলাম জিজ্ঞাসা করিবে। জেহান আরার দাস-দাসীরও অর্থের অভাব ছিল না। দেশের বড় বড় লোক সম্রাটের নিকট কোন আবেদন করিতে আসিলে সাহেব বেগমকে উপঢৌকন না দিলে কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইত না। কেহ একটী উচ্চ কর্ম্মের প্রার্থী, কেহ একটী বিষয়ের প্রার্থী, কেহ প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছেন তাহার ক্ষমা চাহেন, কেহ পরের তালুক কাড়িয়া লইয়াছেন তাহার একটী সনন্দপত্র চাহেন, কোন যোদ্ধা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন বা কাপুরুষতা দেখাইয়াছেন তাহার ক্ষমাপ্রার্থী, কাহারও উপর সম্রাটের অন্যায় ক্রোধ হইয়াছে, সে ক্রোধ হইতে নিস্তার পাওয়া আবশ্যক;—সকলেই রাশি রাশি হীরা, মুক্তা ও অর্থ সাহেব বেগমের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আপন আপন আবেদন জানাইতেন। সাহেব বেগমের দাসীরাও অর্থে বঞ্চিত হইত না।

"তাহার পর শৈলেশ্বর যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তুমি জান। সে উপায় বিফল হইল, আমার আশা বিফল হইল, দুই দিন পর্ব্বতগহ্বরে নিজ নারীবেশে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তুমি সুরায় উন্মত্ত ছিলে, দেখিয়াছিলে কি না জানি না। প্রথম দিন তোমার পদতলে রোদন করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় দিবস তোমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিলাম। হস্ত হইতে দুইবার খড়্গ পড়িয়া গেল; তাতারের হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া যায় কখনও জানিতাম না, আমি এরূপ ক্ষীণ তাহা জানিতাম না।

"পরে তোমার সহিত পুনরায় আগ্রায় আসিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম বঙ্গদেশ হইতে একজন ধনাঢ্য জমীদার আসিয়াছে,—তোমার হেমকে দেখিলাম। পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রী তোমার হেম? উঃ—আর যাতনা সহ্য করিতে পারি না। মথুরার প্রধান মন্দিরে তিন দিন পর যাইও, পরস্ত্রীকে আবার দেখিও; তুমি আমাকে হতভাগিনী করিয়াছ, তোমাকেও হতভাগা করিব, সেই জন্য এই সমাচার দিলাম, সেই জন্য আগ্রার দুর্গে লইয়া যাইয়া হেমকে দেখাইয়াছিলাম।

"আমার মৃত্যু সন্নিকট, কিন্তু জিঘাংসা তাতারের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্ম ভুলি নাই, আমার শোণিত শীতল হয় নাই।

"উঃ! আমার মস্তক ঘুরিতেছে। যদি এ তৃষার্ত্তকে স্নেহ-বারি দান করিতে, তবে মুসলমানী অকৃতজ্ঞ হইত না; যতদিন জীবন থাকিত,—

উঃ! আর দেখিতে পাই না। নরেন্দ্র! এ জীবনের জন্য বিদায় দাও, যদি মৃত্যুর পর আর একবার দেখা হয়, নিষ্ঠুর নরেন্দ্র! এই হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের ভাব তোমাকে দেখাইব। নরেন্দ্র! তখন তুমি আমাকে ভাল বাসিবে,—নতুবা এই ছুরিকাদ্বারা তোমার পাষাণ-হৃদয় চূর্ণ করিব।

উন্মাদিনী জেলেখা।"

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্রের নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি পড়িল। তিনি নিস্তব্ধে চিন্তা করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে, সমস্ত নগর নিস্তব্ধ। নরেন্দ্র পদচারণ করিতে করিতে অনেক দূর যাইয়া পড়িলেন, দেখিলেন সম্মুখে যমুনা।

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এরূপ সময় দেখিলেন যমুনাতীরে একস্থানে কতকগুলি লোক সমবেত হইয়া একটী মৃতদেহ ভূমিতে সন্নিবেশিত করিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সেই লোকের মধ্যে একজন উত্তর দিলেন—

"মৃত ব্যক্তি পূর্ব্বে বেগমমহলে দাসী ছিল, একজন কাফের সৈনিকের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়া বাহির হইয়া যায়। বোধ হয় সে সৈনিক উহাকে এক্ষণে হত্যা করিয়াছে। দাসীর বক্ষঃস্থলে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসান দেখিলাম। হতভাগিনীর নাম জেলেখা।"

নরেন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন সে জেলেখার নিজের ছুরিকা। নরেন্দ্র জানিলেন, অভাগিনী আত্মঘাতিনী হইয়াছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

মথুরা।

সায়ংকালে শান্তপ্রবাহিনী যমুনাকূলে মথুরা নগরী বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে, গগনে নক্ষত্র এক একটী করিয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে, যমুনার নীল বিশাল বক্ষের উপর দিয়া সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে; সমস্ত জগৎ শীতল ও শান্ত। মথুরার প্রস্তর-বিনির্ম্মিত ঘাট-শ্রেণী জল পর্য্যন্ত নামিয়াছে, ও বৃক্ষ ও কুঞ্জ-বনের ভিতর দিয়া মথুরার দেব-মন্দির ও হর্ম্ম্যাবলি দেখা যাইতেছে।

ক্রমে রজনী অধিক হইল; হেমন্তকালের চন্দ্রালোকে নদী, গ্রাম, বৃক্ষ ও হর্ম্ম্যাবলি অতি সুন্দর কান্তি ধারণ করিল। নীল গগনে সুধাংশু

যেন ধীরে ধীরে ভাসিতেছে; নদীবক্ষে দুই একখানি ক্ষুদ্রতরী ভাসমান রহিয়াছে; নদীর দুই পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণ বৃক্ষশ্রেণী নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রের সুধাবর্ষণে সমগ্র জগৎ তৃপ্ত হইয়া সুখে নিদ্রিত রহিয়াছে।

সহসা নগরের মধ্যে সায়ংকালীন পূজা আরম্ভ হইল; একেবারে শত দেবালয় হইতে শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদ শ্রুত হইতে লাগিল, সায়ংকালীন বায়ুহিল্লোলে সুদূরশ্রুত সে নিনাদ কি সুমধুর, কি মিষ্ট! সেই ঘণ্টারব ধীরে ধীরে নদীর বক্ষে ও নগরের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেই নীল অনন্ত নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল; ধার্ম্মিকদিগের মন যেন মুহূর্ত্তের জন্যও পৃথিবীর চিন্তা বিস্মরণ হইয়া সেই পবিত্র ঘণ্টা-রবের সহিত গগনের দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল।

নদীকূলে একটী প্রস্তরবিনির্ম্মিত সোপানশ্রেণীর উপরই একটী প্রকাণ্ড দেবমন্দিরে আরতি হইতেছিল। বহুসংখ্যক্ ব্রাহ্মণ ও পূজক উচ্চৈঃস্বরে সায়ংকালীন গীত গাইতেছিল, তাহাদের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য যাত্রী সেই মন্দির বেষ্টন করিয়া সেই গান শুনিতেছিল। যাত্রিদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক, বহুদূর হইতে, বহু দেশ হইতে এই পুণ্যস্থানে সমবেত হইয়া অদ্য মন্দির দর্শন করিয়া যেন জীবন চরিতার্থ করিলেন।

আরতি শেষ হইল, যাত্রিগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল, কেবল দুই-জন স্ত্রীলোক সেই মন্দিরপার্শ্বে একটী বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপ-কথন করিতেছিলেন।

হেমলতা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

"দিদি, মুসলমান পাগলিনী বলিয়াছিল আজ এই মন্দিরে নরেনের সঙ্গে দেখা হইবে, কৈ তাহা হইল না?"

শৈবলিনী অতিশয় বুদ্ধিমতী, তিনি হেমের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যদিও হেম হাসিতে হাসিতে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তথাপি হেমের হৃদয় অদ্য যথার্থ উদ্বেগপরিপূর্ণ। সেই আশায় হেমের হৃদয় আজি সজোরে আঘাত করিতেছে, হেমের শরীর এক একবার অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে।

শৈবলিনী মনে মনে ভাবিলেন, "আজি না জানি কি কপালে আছে, হেম বালিকামাত্র, নরেন্দ্রকে দেখিলে আবার পূর্ব্বকথা মনে পড়িবে, সে অসহ্য যাতনা বালিকা সহ্য করিতে পারিবে না।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে পাগলিনীর কথা কি বিশ্বাস করে? নরেন্দ্র কোথায়, কোন্ দেশে আছে, তাহার সহিত মথুরায় দেখা হইবার আশা করিতেছ?"

হেম। "না, আশা করি না, পাগলিনী বলিয়াছিল সেই কথা বলিতেছিলাম। কিন্তু দিদি, জেলেখার অন্য কথাগুলি ত ঠিক হইয়াছিল।"

শৈব। "ঐ প্রকারে উহারা মিথ্যা আশা জন্মায়, দুটা সত্য বলে একটা মিথ্যা কথা বলে। কৈ আমাদের দাসী আসিল না? আমি যে ঠিক পথ চিনি না, না হইলে আমরা দুই জনেই বাড়ী যাইতাম।

হেম। "তাড়াতাড়ি কি? এখনও রাত্রি অধিক হয় নাই, আর এ স্থানটী কি সুন্দর। দেখ দিদি, আমার বোধ হইতেছে যেন এই আমাদের বীরনগর, যেন এই গঙ্গা, আর বাল্যকালে চন্দ্রালোকে গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম, তোমার সহিত খেলা করিতাম আর, আর,—আর, সকলের সহিত খেলা করিতাম, সেই কথা মনে পড়িতেছে।"

শৈবলিনীর মুখ আরও গম্ভীর হইল, তিনি দাসীর আসিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইলেন। হেম তাহা লক্ষ্য না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"দেখ দিদি, ঐ নৌকাখানি কেমন তীরের মত আসিতেছে, উঃ! মাজিরা কি জোরে দাঁড় বাহিতেছে, উঃ! যেন উড়িয়া আসিতেছে।"

শৈবলিনী সেই দিকে দেখিলেন; তাঁহার ভয় দ্বিগুণ হইল। তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল,—নৌকা ঘাট হইতে আট হস্ত দূরে থাকিতে থাকিতে একজন সৈনিক লম্ফ দিয়া ঘাটে পড়িলেন,—তিনি নরেন্দ্রনাথ।

হেম বৃক্ষের ছায়ায় ছিলেন, নরেন্দ্র তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া মন্দিরের ভিতর যাইলেন। কিন্তু নরেন্দ্রকে হেম দেখিয়াছিলেন; সেই মুহূর্ত্তে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত হেমের মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইল; চক্ষু, কর্ণ, ললাট, স্কন্ধ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল; পরমুহূর্ত্তে সমস্ত মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী সভয়ে হেমকে ধরিলেন; হেম কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিলে শৈবলিনী গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"হেম, আমি তোমাকে ভগ্নী অপেক্ষা ভালবাসি, আমি বলিতেছি, আজ নরেনের সহিত দেখা করিও না, বাড়ী চল। তুমি আমাকে ভগ্নী অপেক্ষা ভালবাস, আমার এই কথাটী শুন, বাড়ী চল। তুমি বালিকা, আপনার মন জান না,—নরেনের সহিত অদ্য তোমার কথোপকথন হইলে কি বিপদ ঘটিবে ভগবান জানেন।"

হেমলতা মুখ নত করিয়া এই কথা শুনিলেন, অনেকক্ষণ ভূমির দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ অশ্রু স্বচ্ছ বালুকায় পড়িয়া অদৃশ্য হইল। আবার ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন, তখন উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন নাই,—হেমের মুখখানি শান্ত, নির্ম্মল, স্থির; নয়নে কেবল একবিন্দু জল।

শৈবলিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"দিদি, তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিও না। দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, আমাকে কত ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছ, আমি তাহা ভুলি নাই, আমি তোমার অবিশ্বাসিনী নহি। আজি এইমাত্র দেবপূজা সাঙ্গ করিলাম, এই পুণ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া এই পুণ্য দেবমন্দিরে আমি অবিশ্বাসিনী হইব না। আর যিনি আমার প্রধান দেবতা, যে দেবতুল্য স্বামী আমাকে ভাল বাসেন, আমার জীবনের যিনি সর্ব্বস্ব ধন, জীবন থাকিতে এ দাসী তাঁহার অবিশ্বাসিনী হইবে না। দিদি, আমাকে সন্দেহ করিও না, আমাকে মন্দ ভাবিও না, তুমি আমাকে মন্দ ভাবিলে এ সংসারে অভাগিনীকে কে ভাল বাসিবে?" হেমলতার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িয়া সমস্ত মুখমণ্ডল সিক্ত হইতেছিল।

তখন শৈবলিনীর মন শান্ত হইল, শৈবলিনীরও চক্ষুতে জল আসিল। তিনি সস্নেহে হেমের চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন—

"হেম আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ধর্ম্মপরায়ণা, তুমি পতিব্রতা, আমি যে মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিয়াছিলাম সে জন্য ক্ষমা কর।"

হেম। "দিদি, তুমি ক্ষমা চাহিও না, তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, তোমার ঋণ আমি ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। জন্মে জন্মে যেন তোমার ভগ্নী হই, আর আমার কিছু প্রার্থনা নাই।"

আবার দুইজনে দুই জনকে ধরিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—দুই জনেরই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। সে স্নেহের জল, ভালবাসার জল; পরস্পরের ভালবাসায় পরস্পর কত সুখী, সেই কথা স্মরণ করিয়া দুই জনের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। পরে শৈবলিনী বলিলেন—

"রাত্রি হইতেছে, যাও, নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া আইস।"

শৈবলিনী সেই বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, হেমলতা মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হেমলতার এক্ষণে উদ্বেগ নাই, তিনি ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকটে আসিয়া বসিলেন ও নম্রভাবে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এতদিনের পর হৃদয়ের হেমকে পাইয়া নরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইল, তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র হেমের হাত ধরিয়া পিপাসিতের ন্যায় সেই অমৃতমাখা মুখখানি দেখিতে লাগিলেন, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হেম আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনিও মস্তক নত করিয়া রহিলেন, তাঁহার নয়ন ছল ছল করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পর হেমলতা নরেন্দ্রের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বলিলেন. "নরেন্দ্র!"

নরেন্দ্র দেখিলেন, হেমের মুখে আর উদ্বেগের চিহ্ন নাই, লজ্জার চিহ্ন নাই, মুখমণ্ডল নির্ম্মল ও পরিষ্কার, ধীরে ধীরে হেমলতা বলিলেন, "নরেন্দ্র!"

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

মাধবীকঙ্কণ।

দেবালয়ের সমস্ত দীপ তখন নির্ব্বাণ হইয়াছে ও সমস্ত লোক সুপ্ত অথবা চলিয়া গিয়াছে। স্তম্ভ ও প্রকোষ্ঠের উপর সুন্দর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে ও সারি সারি স্তম্ভচ্ছায়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে। পার্শ্বে বিশাল যমুনানদী চন্দ্রকরে নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতেছে, ও রহিয়া রহিয়া শীতল যমুনার বায়ু মন্দিরের ভিতর দিয়া গাইয়া যাইতেছে। সেই সুস্নিগ্ধ রজনীতে পবিত্র মন্দিরের একটী স্তম্ভচ্ছায়াতে নিস্তব্ধে নরেন্দ্র ও হেম বসিয়া রহিয়াছেন।

হেম স্থিরভাবে বলিলেন—

"নরেন্দ্র! অনেক দিন পর আমাদের দেখা হইয়াছে, আবার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না, আমাদের মনের যা কথা আইস তাহাই কহি।

"নরেন্দ্র! বাল্যকালে আমরা দুই জনে গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম, কত স্বপ্ন দেখিতাম; এক্ষণে তুমি সৈনিকের ব্রতে ব্রতী হইয়াছ, আমি পরের স্ত্রী; নরেন্দ্র, বাল্যকালের স্বপ্ন একেবারে বিস্মরণ হও।"

হেমলতা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আবার বলিলেন—

"বিধাতা যদি অন্যরূপ ঘটাইতেন, তবে আমাদের জীবন অন্যরূপ হইত, বাল্যকালের স্বপ্ন সফল হইত। কিন্তু নরেন্দ্র, আমরা যেন ভ্রমেও

বিধাতার নিন্দা না করি। যিনি তোমাকে পরাক্রম দিয়াছেন, যশ দিয়াছেন, তাঁহার নাম লও, অবশ্য তোমাকে সুখী করিবেন। যিনি আমাকে এই সংসারে স্থান দিয়াছেন, দেবতুল্য স্বামী দিয়াছেন, শৈবের ন্যায় ননদিনী দিয়াছেন, ধন দিয়াছেন, ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, তিনি দয়ার সাগর, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।”

হেমলতা গলায় বস্ত্র দিয়া করযোড়ে বিশ্বের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও পবিত্র প্রেমরস ও শান্তি-রসে পরিপূর্ণ।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া হেমলতার মুখের দিকে চাহিলেন, নিজ নয়ন হইতে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন—

“হেমলতা, আমি এতদিন তোমাকে জানিতাম না. তুমি মানবী না দেবী? এরূপ সহিষ্ণুতা, এরূপ যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান আমি এ জগতে দেখি নাই, কখন দেখিব না।”

দুই জনে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হেমলতা আবার বলিতে লাগিলেন—

“নরেন্দ্র, আমি শুনিয়াছি তুমি অনেক যুদ্ধ করিয়াছ, অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ, সকল দেশেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছ। তুমি পুণ্যাত্মা, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন। কিন্তু যদি যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা কর, বা যদি বিপদ বা দরিদ্রতায় পতিত হও, আবার বীর-নগরে যাইও, তুমি যাইলে সকলেই আহ্লাদিত হইবেন। আমার স্বামীর হৃদয় আমি জানি, তিনি তোমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় ভালবাসেন, সর্ব্বদাই সস্নেহে তোমার কথা কহেন, তুমি যাইলে বড় আহ্লাদিত হইবেন।”

নরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন; হেমের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তাঁহার নয়ন দুটীও পরিপূর্ণ। হেম আবার বলিতে লাগিলেন—

“আর শৈবলিনীও তুমি যাইলে কত আহ্লাদিত হইবেন, আর হেমলতা যত দিন জীবিত থাকিবে, কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় তোমার সেবা শুশ্রূষা করিবে। ভাই নরেন! আমি তোমাকে যখন দেখিব তখনই আহ্লাদিত হইব।”

এই স্নেহবাক্য শুনিয়া নরেন্দ্রের চক্ষুতে আবার জল আসিল; আবার দুইজনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

শেষে হেম ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—“নরেন্দ্র, আর একটী কথা আছে, কিছু মনে করিও না; আমি অভাগিনী, আমার দোষ গ্রহণ

করিও না। নরেন্দ্র, আমাদের বিদায়কালে প্রণয়চিহ্নস্বরূপ আমাকে একটী দ্রব্য দিয়াছিলে, সেটি পরিধান করিতে আমি অধিকারিণী নহি; নরেন্দ্র! সেটী ফিরিয়া লও।”

হেমলতা আপন হস্তের বস্ত্র তুলিয়া লইলেন, নরেন্দ্র দেখিলেন তিনি যে মাধবীকঙ্কণ দিয়াছিলেন তাহা এখনও রহিয়াছে। লতা শুষ্ক হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে ও অনেক স্থলে একেবারে চূর্ণ হইয়া ধূলিবৎ হইয়াছে, হেমলতা সেই অসংখ্য খণ্ডকে একে একে সূতার দ্বারা গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন।

উভয়ের পূর্ব্বকথা মনে আসিতে লাগিল, উভয়ের হৃদয় বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল, উভয়েই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; নরেন্দ্র হেমলতার সেই সুন্দর বাহু ও সেই মাধবীকঙ্কণ দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল, আর দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দর-বিগলিত ধারায় অশ্রুবারি পড়িয়া হেমলতার হস্ত ও বাহু সিক্ত করিল। অবশেষে নরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—

“হেম, তবে কি জীবনের জন্য আমাকে বিস্মরণ করিবে?”

হেম বলিলেন, “জীবন থাকিতে তোমাকে বিস্মৃত হইব না; চিরকাল সহোদরার ন্যায় তোমার কথা ভাবিব। কিন্তু এই কঙ্কণ অন্যরূপ প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ আমাকে দিয়াছিলে;—নরেন্দ্র, আমি সে প্রণয়ের অধিকারিণী নহি। নরেন্দ্র, মনে ক্লেশবোধ করিও না; আমি এই কয় বৎসর ঐ কঙ্কণটী পূজা করিয়াছি, হৃদয়ে রাখিয়াছি, উহা ত্যাগ করিতে আমার যত কষ্ট হইতেছে, নরেন, তাহা তুমি জান না। কিন্তু উটি উন্মোচন কর, উহাতে আমার অধিকার নাই; নরেন্দ্র, আমি অবিশ্বাসিনী পত্নী নহি।”

নরেন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না। নিঃশব্দে হেমলতার হস্ত হইতে সেই কঙ্কণ খুলিয়া লইলেন; তখন হেমলতা বলিলেন—

“নরেন্দ্র! আমি চলিলাম, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, বাল্যকাল হইতেই তোমার ধর্ম্মে আস্থা আছে, সে ধর্ম্ম কখনও বিস্মরণ করিও না, জগদীশ্বর তোমাকে সুখী রাখিবেন। তিনি যাহাকে যাহা করিয়াছেন, যেন আমরা সেইরূপ থাকিতেই চেষ্টা করি। পুষ্পটী দুই এক দিন সুগন্ধ বিস্তার করিয়া শুষ্ক হইয়া যায়, পক্ষীটী আলোকে প্রফুল্ল হইয়া গান করে, তাহাদের সেই কার্য্য। নরেন্দ্র, তুমি বীরপুরুষ, শত্রুকে জয় কর, দেশের মঙ্গল কর, পদাশ্রিত ক্ষীণের প্রতি দয়া করিও। আর ভগবান আমাকে দেবতুল্য

স্বামী দিয়াছেন, তিনি সহায় হউন, সেই স্বামীর সেবায় যেন আমি কখন না ত্রুটি করি, সেই স্বামীতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আমি যেন তাঁহারই চিরপতিব্রতা দাসী হইয়া থাকি। নরেন্দ্র!—ভাই নরেন! বাল্যকালে তুমি আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলে, এই পবিত্র দেবমন্দিরে আবার সেই শিক্ষা দাও; এস ভাই আমরা প্রতিশ্রুত হই, ধর্ম্মপথ কখনও ত্যাগ করিব না; আমি জন্মে মরণে স্বামীর চিরদাসী থাকিব।" কথা সাঙ্গ করিয়া হেমলতা দেবপ্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইল, নরেন্দ্রও নিঃশব্দে প্রণত হইলেন।

উঠিয়া আবার সযত্নে নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া হেমলতা বলিল—"ভাই নরেন! এক্ষণ রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিদায় দাও,—আমি চিরকাল তোমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিব, তুমিও তোমার কনিষ্ঠ ভগ্নীকে মনে রাখিও।" একবিন্দু জল নয়ন হইতে মোচন করিয়া হেমলতা ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যতক্ষণ দেখা যাইল নরেন্দ্র হেমের প্রতি চাহিয়া রহিলেন,—তাহার পর? তাহার পর এ জগতের মধ্যে নিতান্ত দুর্ভাগ্য লোকও নরেন্দ্রের সে রজনীর শোক ও বিষাদ দেখিলে বিষণ্ণ হইত। সে শোকের শেষ নাই, সে বিষাদের শান্তি নাই। অভাগার হৃদয় আজি শূন্য হইল, অভাগার সে দুঃখরোদন অবারিত, অলক্ষিত, অশান্তিপ্রদ।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রয়াগের যুদ্ধ।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল, কেবল আখ্যায়িকার নায়ক নায়িকাদিগের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে বাকি আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শাসুজা বঙ্গদেশ হইতে দ্বিতীয়বার যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছিলেন। শীতকালে প্রয়াগের নিকট সুজা ও আরংজীবের মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়। দুই দিনের যুদ্ধের পর সুজা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। যশোবন্তসিংহ এই যুদ্ধে আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহাযোদ্ধার অধিক ক্ষতি করিতে পারিলেন না ক্ষোভে রাজস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সুজা প্রয়াগ হইতে পাটনা, পাটনা হইতে মুঙ্গের, মুঙ্গের হইতে রাজমহল এবং তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া তণ্ডায় পলায়ন করিলেন। আরংজীবের পুত্র মহম্মদ এবং সেনাপতি-আমির জুমলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন

করিতেছিলেন। তৎপায় মহম্মদ সুজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুজার পক্ষাবলম্বন করিলেন, কিন্তু উভয়েই আমির জুমলার নিকট পরাস্ত হইলেন; মহম্মদ পিতার কপটপত্রে বিশ্বাস করিয়া সস্ত্রীক সুজার পক্ষ ত্যাগ করিলেন,—অভাগা সুজা আরাকানে পলায়ন করিলেন; তথাকার রাজার সহিত বিরোধ হওয়ায় সুজা সসৈন্যে হত হইলেন, তাঁহার কন্যাকে রাজা বিবাহ করিলেন; কথিত আছে সুজার রূপবতী সহধর্ম্মিণী প্যারীবানু বিষাদে আত্মহত্যা করিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর বঙ্গদেশে সুশাসন করিয়াছিলেন, যিনি যুদ্ধে সাহস, শাসনে দয়া ও হিন্দুদিগের প্রতি বদান্যতার জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন, যাঁহার রাজমহলের প্রাসাদ মর্ত্ত্যে ইন্দ্রপুরী ছিল ও দিবারাত্র আনন্দ-লহরীতে ভাসিত,—তিনি মৃত্যুকালে মস্তক রাখিবার স্থান পাইলেন না, বিদেশে শত্রুহস্তে সবংশে বিনষ্ট হইলেন।

দারা শ্যামনগর অথবা ফতেআবাদের যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিন্ধুদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন; আরংজীবের সৈন্য তথা হইতে দারাকে দিল্লী লইয়া আইসে। নৃশংস সম্রাট্ জ্যেষ্ঠকে যথেষ্ট অপমান করিয়া পরে হত্যা করেন। কারারুদ্ধ মোরাদও অচিরাৎ রাজাজ্ঞায় হত হইলেন। ভ্রাতৃরক্তে স্নাত হইয়া আরংজীব ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

যেদিন মথুরায় হেমের সহিত নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার পর নরেন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলেন। হেমলতা বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্রের অনেক অনুসন্ধান করাইলেন, মহানুভব শ্রীশচন্দ্র দেশে দেশে সংবাদ পাঠাইলেন যে, নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর অর্দ্ধ অংশ ছাড়িয়া দিবেন,—কিন্তু সেই দিনের পর নরেন্দ্রকে আর কেহ কোথাও দেখিতে পাইল না।

হেমলতা বীরনগরে শ্রীশচন্দ্রের সহিত বাস করিতে লাগিলেন; মথুরা-মন্দিরে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন হেম তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। পতি-সেবায় ধর্ম্মপরায়ণা হেমের অন্য চিন্তা তিরোহিত হইল, পতিভক্তি ভিন্ন ধর্ম্ম তিনি আর জানিতেন না। ক্রমে শ্রীশচন্দ্রের ঔরসে তাঁহার হেমন্ত-কুমারী ও সরযুবালা নামক দুইটী কন্যা ও প্রতাপ নামে একটী পুত্র জন্মিল; বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে নরেন্দ্র ও হেমলতা যেরূপ সায়ংকালে গঙ্গাতীরে খেলা করিত, বাষ্পোৎফুল্ল-লোচনে হেমলতা দেখিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সেইস্থানে সেইরূপে খেলা করিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আনন্দধ্বনিতে চারিদিকের কুঞ্জবন প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সংসারের এই গতি,—একদল যাইতেছে, অন্যদল আসিতেছে! আহা! শিশুদিগের ললাট

পরিষ্কার, নয়ন উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল চিন্তাশূন্য, এখনও মানবজীবনের চিন্তায় সে স্বর্গীয় অবয়ব অঙ্কিত হয় নাই।

হেমলতার বিবাহের প্রায় দশ বৎসর পর হেমলতা পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া একটী সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিতে গেলেন। বীরনগর হইতে কয়েক ক্রোশ দূর একটী প্রসিদ্ধ শিমুল বৃক্ষ ছিল। শিমুল বৃক্ষের গুঁড়ী হইতে প্রায়ই তিন দিকে তিনটী দেয়ালের মত বাহির হয়, এই বৃক্ষের সেই "দেয়াল" গুলি এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, যেন একটী উন্নত ঘরের ন্যায় হইয়াছিল। সেই অপরূপ বৃক্ষতলে একটী অপরূপ সন্ন্যাসী কয়েক বৎসর অবধি বাস করিতেছিলেন। পল্লীগ্রামস্থ গৃহিণী ও বালিকাগণ সস্নেহে সেই সন্ন্যাসীকে প্রত্যহ খাদ্য আনিয়া দিত, তাহাতেই তিনি জীবন-ধারণ করিতেন। সমস্ত দিন তিনি প্রায় ধ্যানে রত থাকিতেন, সায়ংকালে সেই গ্রামের ভিতর গৃহে গৃহে যাইতেন, বিধবাকে সান্ত্বনা করা, পীড়িতকে শুশ্রূষা করা, দুর্ব্বলকে সাহায্য করা, মানবের কষ্ট নিবারণ করা তাঁহার কার্য্য। গভীর রজনী পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া আবার তিনি সেই তরুগৃহে ফিরিয়া আসিতেন, তথায় ঘাসের উপর তিনি সকল কালে, বৃষ্টিতে, শীতে, গ্রীষ্মে সমান নিদ্রা যাইতেন। সেই তরুগৃহ ও সেই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য অনেক দেশ হইতে অনেক লোক আসিত।

হেমলতা বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, ধীরে ধীরে পদব্রজে তরুর নিকটে যাইয়া সন্ন্যাসীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। কি দেখিলেন জানি না, কিন্তু সে দিক্ হইতে নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না, নিস্পন্দে দেখিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি হেমলতার দিকে চাহি-লেন, সহসা দণ্ডায়মান হইলেন। তীব্রদৃষ্টিতে হেমলতার দিকে আবার চাহিলেন, পরে ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"পতিব্রতা হও। জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।" সন্ন্যাসী সহসা মুখ ফিরাইলেন, বোধ হইল যেন নয়ন হইতে একবিন্দু বারি মুছিয়া ফেলিলেন; ধীরে ধীরে সেই তরু হইতে একটী জঙ্গলের দিকে চলিলেন, সেই জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর আর সে তরুতলে কেহ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল না। সন্ন্যাসী সে গ্রাম হইতে কোথায় চলিয়া গেল কেহ আর জানিতে পারিল না।

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.